দশম রঞ্জন

যখন একটা নূতন ছেলে আমাদের ক্লাসে এসে আমাদের পুরোপুরি হকচকিয়ে দিল।

গত তিন দিন আমি স্কুলে যাই নি—ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু দুশ্চিন্তার মাঝে আছি। আমি জানি স্কুলে গেলেই সবাই জিজ্ঞেস করবে, "কীরে! তুই তিন দিন স্কুলে আসিস নাই—ব্যাপারটা কী?" সত্যি কথাটা বলতে পারব না কারণ সেটা দশজনকে বলার মতো না। বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলতে হবে—খালি ভয় যে ধরা না পড়ে যাই!

মানুষের কত রকম মজার মজার অসুখ হয়—কয়দিন আগে জাহিদের এপেন্ডিসাইটিস না কী একটা জিনিসের অপারেশন হল, সেটা নিয়ে একেবারে হুলস্থুল অবস্থা। আমরা সবাই মিলে দেখতে গেলাম—খালি হাতে তো যেতে পারি না, কেউ একটা চকলেট, কেউ চিউয়িংগাম, কেউ একটা বল পয়েন্ট কলম নিয়ে গেলাম। হাসপাতালে গিয়ে দেখি কেবিনে কী সুন্দর শুয়ে আছে জাহিদ। তার বাবা-মা-খালা-চাচারা তাকে ঘিরে রেখে আহা উঁহু করছেন। দেখে আমাদের তো রীতিমতো হিংসাই হল। মনে হল আহা আমাদের এই এপেন্ডিসাইটিস না কী যেন যন্ত্রণাটার যদি অপারেশন হত কী মজাটাই না হত! তারপর ধরা যাক কাজলের ব্যাপারটা—বিজয় সরণিতে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে তার হাত ভেঙে গেল। আর কী কপাল ভালো, ভাঙল তো ভাঙল ডান হাতটাই ভাঙল, কোনো হোমওয়ার্ক করতে হয় না। হাসপাতাল থেকে হাতে সাদা প্লাস্টার করে দিয়েছে। সে সেই হাতটা গলায় ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমরা সবাই সেই হাতের প্লাস্টারে আমাদের নাম লিখে দিলাম। জয়ন্ত আমাদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর ছবি আঁকে, সে মার্কার দিয়ে কাজলের প্লাস্টার করা হাতে একটা নরমুণ্ডু এঁকে দিল, সেটা দেখতে যে কী ভয়ঙ্কর হল সেটা আর বলার মতো না। তবে কয়দিনের মাঝে অবিশ্যি প্লাস্টারের রঙ ময়লা হয়ে মোটামুটি বিদঘুটে হয়ে গেল, কাজল একটু খবিশ টাইপের, ময়লা হতেই পারে। ময়লা নিয়ে কাজলের বেশি মাথাব্যথা ছিল না—যারা খবিশ টাইপের হয় তারা পরিষ্কার আর ময়লা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার যন্ত্রণা ছিল অন্য জায়গায়, ভেতরে নাকি চুলকাতো, পেন্সিল ঢুকিয়ে সারাক্ষণ সে চেষ্টা করত একটু চুলকিয়ে নিতে। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে প্লাস্টার খুললে দেখব ভিতরে মাকড়সা না হয় তেলাপোকা বাসা বেঁধেছে—তা না হলে এত চুলকাবে কেন? যখন প্লাস্টার খোলা হল দেখা গেল সেরকম কিছু নেই, হাতটা শুধু একটু শুকিয়ে গেছে। প্রথম দিকে জোর কম ছিল, মারপিটে বেশি সুবিধে করতে পারত না। তবে দেখতে দেখতে অবিশ্যি কাজলের হাতে জোর ফিরে এল, তারপর আমাদের কাজল আবার সেই আগের মারদাঙ্গা কাজল।

তবে অসুখের মতো অসুখ হয়েছিল সাদিবের। রাস্তার পাশে চটপটি খেয়ে তার নাকি জন্ডিস হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে কোনো নড়াচড়া নেই, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। সাদিবের কী আনন্দ, দিনরাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভালোমন্দ খায়,

আমরা ডিটেকটিভ বই খুঁজে বের করে দিই, সে শুয়ে শুয়ে পড়ে। পরীক্ষায় দুই সাবজেক্টে এত বড় বড় দুইটা গোল্লা পেল তবুও কেউ বকাবকি করে না। বলে, আহা বেচারার শরীর খারাপ, পরীক্ষাটা দেবে কেমন করে?

সবার এরকম মজার মজার অসুখ কিংবা অ্যাকসিডেন্ট হয় আর আমার বেলা সবকিছু গোলমাল। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন একটা ফোড়া উঠে গেল আর পাজি বেআক্কেল বদমাইশ বেআদপ ফোড়াটা উঠল এমন একটা জায়গায় যে, না পারি বসতে, না পারি বাথরুমে যেতে, না পারি ইয়ে করতে। প্রথম দু-একদিন একটু চেপেচুপে রাখার চেষ্টা করলাম কিন্তু আম্মুদের কাছে তো আর কোনো কিছু গোপন রাখা যায় না। আম্মু একনজর দেখেই ধরে ফেললেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কীরে ইবু, তুই এরকম পা ফাঁক করে হাঁটছিস কেন?"

আমি বললাম, "না মানে ইয়ে—কিছু না। মনে হয় একটা ফোড়া—"

আমি কথা শেষ করার আগেই আম্মু খপ করে ধরে বড় আপুর সামনেই আমার প্যান্ট টেনে নামিয়ে ফেললেন। আমি এত বড় একটা ছেলে, ক্লাস এইটে উঠেছি অথচ আম্মুর কাজকর্ম দেখে মনে হয় আমি বুঝি দুই বছরের একটা খোকা, লজ্জাশরম বলে আমার কিছু নেই! যাই হোক আমি লজ্জার মাথা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার পিছন দিকে তাকিয়ে আম্মু আর বড় আপু চিৎকার করে বললেন, "সর্বনাশ! করেছিস কী?"

আমি দুর্বল গলায় বললাম, "মনে হয় ফোড়া।"

আম্মু বললেন, "ফোড়া কোথায়? এটা তো কার্বাঙ্কল।"

কার্বাঙ্কল কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আম্মু বললেন, "এক্ষুণি চল ডাক্তারের কাছে।"

আমি বইপত্রে পড়েছি আগের যুগের ডাক্তারদের বুকের ভিতরে অনেক মায়াদয়া থাকত, আজকালকার ডাক্তাররা মোটেই সেরকম নয়, তাদের ভেতর মায়াদয়া তো নেইই—উল্টো তারা একটু নিষ্ঠুর টাইপের। আমার পিছন দিকে একনজর দেখে ডাক্তার আনন্দে হা হা করে হেসে উঠে বলল, "আরে ইয়ংম্যান! তুমি কেমন করে এরকম একটা ক্রিটিক্যাল জায়গায় এটা ম্যানেজ করলে?"

আমি কথার উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিষ্ঠুর ডাক্তার বলল, "আমাকে টেকনিকটা শিখিয়ে দাও, আমি যাদের দেখতে পারি না তাদের ক্রিটিক্যাল জায়গায় এটা করিয়ে দিই!"

তারপর ডাক্তার হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব মজার একটা কথা বলে ফেলেছে। আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না যখন দেখলাম ডাক্তারের কথায় আম্মুও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছেন!

ডাক্তার মানুষটা নিষ্ঠুর টাইপের হলেও ডাক্তারিটা মনে হয় ভালোই জানে। তখন তখনই আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে কেটেকুটে দিল। যত ব্যথা পাব ভেবেছিলাম তত ব্যথা পেলাম না—তবে আমি কোনো ঝুঁকি নিলাম না, যতক্ষণ ডাক্তার কাটাকুটি করছিল ততক্ষণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গেলাম! ডাক্তার কাজ শেষ করে ব্যান্ডেজ করে দিল, বাসায় এসে তিন দিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। মোটামুটি হুলস্থুল অবস্থা, কিন্তু কখনো কাউকে সেটা বলতে পারব না। আমাদের ক্লাসের ছেলেপিলেরা যা পাজি, সেটা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। ফোড়ার ব্যাপারটা কোনোভাবে জানতে পারলে আমাকে একটা

নামই দিয়ে দেবে। পিছনে ফোড়া হয়েছে বলে হয়তো নাম দেবে "পাছ-ফোড়ন" চিন্তা করেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

যাই হোক, ভয়ে ভয়ে স্কুলে এসেছি। আমাকে দেখে কাজল ছুটে এল, বলল, "ইবু, তুই স্কুলে আসিস নি, এদিকে কী হয়েছে তো জানিস না!"

আমি কেন স্কুলে আসি নি সেটা নিয়ে তার কৌতূহল নেই দেখে আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"আমাদের ক্লাসে একটা নূতন ছেলে এসেছে।"

নূতন ছেলে আসাটা একটা বড় ঘটনা হতে পারে না, নিশ্চয়ই সেই নূতন ছেলে নিয়ে অন্য কিছু একটা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী করেছে সেই নূতন ছেলে?"

"কিছু করে নাই।"

ক্লাসে নূতন একটা ছেলে এসে কিছু করে নি—সেটা কেমন করে একটা বড় খবর হতে পারে যে, আমি তিন দিন পরে স্কুলে এসেছি এবং দৌড়ে এসে সেই খবরটা আমাকে প্রথমে দিতে হবে? আমার সাথে ঠাট্টা-তামাশা করছে কি না বোঝার জন্যে কাজলের দিকে ভালো করে তাকালাম। কিন্তু তার মুখে সেরকম কোনো চিহ্ন নেই। সে চোখ বড় বড় করে বলল, "বিশ্বাস কর—এই নূতন ছেলেটা কিছু করে না—চুপ করে বসে থাকে।"

"চুপ করে বসে থাকে?"

"হ্যাঁ। চুপ করে বসে থাকে আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্যারেরা কিছু বলে না? কিছু জিজ্ঞেস করে না?"

"উঁহুঁ। স্যারেরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না।"

"পড়া ধরে না?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্! স্যারেরা পড়াও ধরে না।"

এবার আমাকে মানতে হল যে ব্যাপারটা আসলেই রহস্যজনক। ক্লাসে একটা নূতন ছেলে এসেছে, কোনো স্যার তাকে পড়া ধরবে না এটা কী রকম কথা? স্যারদের কাজই হচ্ছে পড়া ধরে যন্ত্রণা দেওয়া—যে যত কম পড়াশোনা করবে তাকে তত বেশি পড়া ধরবে—তত বেশি যন্ত্রণা দেবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কী ছেলেটার?"

কাজল মাথা নেড়ে বোকার মতো বলল, "নামটাও জানি না। রোল নাম্বার ফিফটি ফোর।"

"আরে গাধা—রোল নাম্বার দিয়ে আমি কী করব? নাম জিজ্ঞেস করিস নি?"

"করেছি। কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না।"

"উত্তর দেয় না? এইটা কী রকম কথা!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "একটা প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে না কেন?"

কাজল একটু রাগ হয়ে বলল, "আমি সেটার কী জানি? তোর ইচ্ছে হলে তুই জিজ্ঞেস করে দেখিস।"

ততক্ষণে জয়ন্ত আর কাসেমও এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। জয়ন্ত বলল, "বিস্ময়কর! অত্যন্ত বিস্ময়কর!"

আমরা সবাই চোখ পাকিয়ে জয়ন্তের দিকে তাকালাম, সে হচ্ছে আমাদের ক্লাসের কবি এবং শিল্পী, সে কথাবার্তায় কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে। কোনো একটা কিছু দেখে আমরা যদি বলি, "ইস্! কী সুন্দর।" জয়ন্ত তখন বলবে, "আহা! কী হৃদয়গ্রাহী!" যখন আমাদের মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হয়, আমরা একজন আরেকজনকে বলি, "তোরে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।" জয়ন্ত তখন বলে, "তোমাকে শারীরিক নির্যাতন করা প্রয়োজন।" শুধু যে কথাবার্তায় এরকম তা নয়, তার ভাবভঙ্গিতেও একটা কবি কবি ভাব আছে। যখন আকাশ কালো করে মেঘ এসে বৃষ্টি নামব নামব করতে থাকে, আমরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে পারব না বলে মেজাজ খারাপ করে বসে থাকি, তখন জয়ন্ত আকাশের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে, "আজ মেঘমেদুর বরষায়—"। আমাদের সবার সন্দেহ যে, সে পুরো সঞ্চয়িতা মুখস্থ করে রেখেছে। তবে কবি কবি ভাব থাকলেও জয়ন্ত মানুষটা খারাপ না। তার সাথে কথাবার্তা বলা যায়, ক্রিকেট খেললে জান দিয়ে ফিল্ডিং করে। শুধু যে সঞ্চয়িতা আর জীবনানন্দ দাশ পড়ে তা না, ডিটেকটিভ বই আর সায়েন্স ফিকশানও পড়ে।

জয়ন্ত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইবু, কাজলের কথা সত্যি। এই ছেলেটা আসলেই অন্যরকম। তুই দেখলেই বুঝবি।"

কাসেম কোনো কথা বলল না, শুধু নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" করে একটা শব্দ করল। কাসেম এমনিতেই খুব কম কথা বলে এবং তার নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" করে শব্দ করাটাই একটা বিশাল ব্যাপার। আমরা আধ ঘণ্টা বকরবকর করে যে জিনিসটা কাউকে বোঝাতে পারি না কাসেম নাক দিয়ে একবার "ঘ্রোঁত" করে একটা শব্দ করলেই সবাই সেটা বুঝে ফেলে। তার অবিশ্যি একটা কারণ আছে। কাসেম খুব বেশি লম্বা না কিন্তু তার পুরো শরীর হচ্ছে লোহা দিয়ে তৈরি। তার শরীরে কোনো বাজে খরচ নেই। মাথার নিচেই শরীর এবং সেই শরীরে পাকানো দড়ির মতো "মাসল" কিলবিল কিলবিল করে। সে ইচ্ছে করলে তার যে কোনো দুই আঙুলের চাপ দিয়ে আমার কিংবা কাজলের কিংবা জয়ন্তের মাথা টিকটিকির ডিমের মতো পটাশ করে ফাটিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সে কখনোই সেটা করে না। তার শরীরটা গণ্ডারের মতো হলেও তার মনটা কচি শসার মতো নরম। সে রেগে উঠলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় সে বেশি রাগে না। তারপরেও মাঝে মাঝে কিছু গাধা ছেলে তার সাথে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করে। তারপর যা একটা ব্যাপার ঘটে সেটা আর বলার মতো না। একবার সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল, যাকে নিয়ে ঘটল সে এস.পি.র ছেলে। কাজেই স্কুলে একেবারে হুলস্থুল পড়ে গেল। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তখন ঠিক করলেন কাসেমকে বেত দিয়ে পিটিয়ে সিধে করবেন। বান্দরবানের পাহাড় থেকে আনা তার স্পেশাল বেত দিয়ে কাসেমকে পিটাতে পিটাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার কাহিল হয়ে গেলেন। কাসেম তখন বলল, "স্যার আপনি টায়ার্ড হয়ে গেছেন—একটু রেস্ট নিয়ে নেন।"

এই হচ্ছে আমাদের কাসেম। কাজেই সে যখন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" করে শব্দ করে তখন অবশ্যই আমরা সবাই তার দিকে তাকাই। এবারেও আমরা তার দিকে তাকালাম। কাসেম আবার তার নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" করে শব্দ করে বলল, "কত বড় সাহস—আমার সিটে বসে।"

আমি চোখ তুলে বললাম, "সর্বনাশ!" আমি কল্পনাও করতে পারি না পৃথিবীতে এরকম কোনো মানুষ আছে যে নাকি কাসেমকে তার সিট থেকে সরিয়ে সেখানে বসতে পারে। সারা ক্লাসে সবচেয়ে ভালো সিটটা কাসেমের জন্যে রিজার্ভ করা থাকে—ঠিক উপরে ফ্যান, পাশে জানালা। স্যাররা হঠাৎ করে তাকালেও এই সিটটা একটু চোখের আড়ালে থাকে। এই সিটটাতে নূতন ছেলেটা এসে বসছে সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। আমি কাসেমকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই ছেলেটাকে কিছু বলিস নি?"

"বলেছি।"

"সে কী বলে?"

"কিছু বলে না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।"

"হাসে?"

কাসেমকে দেখে এবারে একটু বিভ্রান্ত মনে হল, বলল, "হাসে না মুখ ভ্যাংচায় বুঝি না।"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মনে হয় ছেলেটার মানসিক সমস্যা আছে। মনোবিকলিত কিশোর।"

আমি জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম মনোবিকলিত মানে কী। কিন্তু তার আগেই সাদিব প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "ইটিশ মিটিশ ইটিশ মিটিশ ফিটিশ—"

আসলে ঠিক এটাই বলে নি কিন্তু শোনাল এরকম। সাদিবের ধারণা যারা ইংরেজিতে কথা বলতে না পারে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই নিজের ভবিষ্যৎটা ঠিক করার জন্যে সে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করে। আমরা কেউই ঠিক ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না—সাদিবও পারে না, কিন্তু সে জন্যে তার কোনোরকম লজ্জাশরম নেই। ভুলভাল ইংরেজিতে সব সময় মুখ বাঁকিয়ে ইংরেজি বলে যায়। এখনো সে ছুটে এসে ইংরেজিতে কিছু একটা বলে ফেলল, সাধারণভাবে বললে হয়তো বুঝতে পারতাম কিন্তু সে সব সময় কায়দা করে বলার চেষ্টা করে, হলিউডের সিনেমায় যেভাবে বলে অনেকটা সেরকম। তাই আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বললি?"

আবার সে কিটিশ মিটিশ করে কিছু একটা বলল। শুনে মনে হল বলছে, "হি ইজ কামিং।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে কামিং?"

সাদিব কিছু বলার আগেই কাজল আর জয়ন্ত একসাথে বলল, "নূতন ছেলেটা।"

কাসেম আবার নাক দিয়ে ঘোঁত করে শব্দ করল, ঠিক তখন আমি নূতন ছেলেটাকে দেখতে পেলাম। আমাদের বয়সী এবং হালকা-পাতলা। আমাদের স্কুলের পোশাক পরেছে, হালকা নীল শার্ট আর নেভি ব্লু প্যান্ট। পোশাকটা ঠিক ফিট করে নি, একটু ঢলঢলে, তারপরেও কেন জানি তাকে জবুথবু মনে হচ্ছে না। আমরা সবাই ব্যাকপেক নিয়ে স্কুলে আসি কিন্তু তার ব্যাগটা অন্যরকম—অনেকটা ওষুধের ক্যানভাসারদের ব্যাগের মতো। আমরা যে কেউ এরকম একটা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে এলে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করত কিন্তু এই ছেলেটাকে কীভাবে কীভাবে জানি এই ব্যাগটাতে মানিয়ে গেছে। শুধু যে মানিয়ে গেছে তাই নয়, মনে হচ্ছে এই ব্যাগ না হয়ে অন্য কোনো ব্যাগ নিলে ছেলেটাকে

মানাতই না। ছেলেটার চোখেমুখে একটা উদাস উদাস ভাব। আমরা যে ক্লাসের এতগুলো ছেলে তার দিকে এইভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছি তাতেও সে এতটুকু অপ্রস্তুত নয়। সে আমাদের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল, তারপর জানালার পাশে কাসেমের সিটটাতে যেখানে তার ব্যাগটা রাখা আছে সেটাকে সরিয়ে নিজের ব্যাগটা রেখে পিছনে হেলান দিয়ে বাইরে তাকাল।

কাসেম তার নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" করে একটা শব্দ করে বলল "দেখলি?"

জয়ন্ত বলল, "চমকপ্রদ। অত্যন্ত চমকপ্রদ।"

সাদিব বলল, "ইটিশ মিটিশ কিটিশ—"

আমি কিছু বললাম না, একটু অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছেলেটার চেহারার মাঝে কিছু একটা বিশেষত্ব আছে। সে যে আমাদের সবাইকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে এই পুরো ব্যাপারটা মনে হয় একটা ভান। আসলে সে মনে হয় চোখের কোনা দিয়ে আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। ছেলেটার এই উদাস উদাস ভাব পুরোটা একটা অভিনয়, এর মাঝে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। আমি বললাম, "আয়, এর সাথে কথা বলি।"

কাজল বলল, "কথা বলবি?"

"হ্যাঁ।"

"দেখিস, তোর সাথে কোনো কথা বলবে না।"

"না বললে নাই।" বলে আমি ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ছেলেটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমরা যখন একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন সে আমাদের দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভাব করল যেন হঠাৎ করে আমাদের দেখেছে। আমি বললাম, "তুমি ভালো আছ?"

ছেলেটা মনে হয় একটু থতমত খেয়ে গেল, নিশ্চয়ই আমার এই প্রশ্নটা আশা করে নি। ছেলেটা তখন মুখে একটা হাসি হাসি ভাব করল—সত্যিকারের হাসি নয়, তাই দেখাল অনেকটা মুখ ভ্যাংচানোর মতো। কাসেমকেও নিশ্চয়ই এই রকম একটা হাসি দিয়েছিল। আমি বললাম, "তুমি নাকি কারো সাথে কথা বল না?"

ছেলেটা আমার কথা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। ভুরু দুইটা এবং কাঁধ দুইটা একসাথে একটু উপরে তুলল, যেটার মানে হচ্ছে আমার যা ইচ্ছা আমি করি, তাতে তোমার কী?

আমি ঠাণ্ডা মাথায় তার সাথে আরো এক-দুইটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু কাসেম তার আগেই নাক দিয়ে "ঘ্রোঁত" শব্দটা করে বলল, "আমার সিট থেকে সরে বস।"

ছেলেটা এবারে পিছনে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কাসেম মেঘস্বরে বলল, "নাহলে কিন্তু লাশ ফেলে দিব।"

ছেলেটা কাসেমের দিকে তাকিয়ে তার ডান হাতের মাঝখানের আঙুলটা পতাকার মতো উঁচু করে ধরল। এটা নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের ইঙ্গিত, ছেলেটার মুখ দেখে মনে হল কোনো একটা খারাপ ইঙ্গিত—কিন্তু সেটা কী আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাসেম আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "শালারে খুন করে ফেলি?"

আমি বললাম, "না কাসেম মাথা গরম করিস না।"

"কেন মাথা গরম করব না? এই শালা আমাকে আঙুল দেখায় কেন?"

আমি কাসেমের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "এর মাঝে নিশ্চয়ই অন্য ব্যাপার আছে।"

"অন্য কী ব্যাপার?"

"সেইটা বুঝতে হবে। মাথা গরম করিস না।"

কাসেম তবু মাথা গরম করতে চাইছিল। আমি তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনলাম। তাকে ধরে টেনে সরিয়ে আনা অবিশ্যি সোজা কথা নয়, কোরবানি ঈদের সময় শুটকোপুটকো একজন মানুষ যখন বিশাল একটা ষাঁড়কে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে, আমার অবস্থাও হল সেরকম।

ফার্স্ট পিরিয়ড বাংলা। সেকেন্ড পিরিয়ড ইংরেজি। এই দুটি ক্লাস মোটামুটি কোনো ঝামেলা ছাড়াই শেষ হল। থার্ড পিরিয়ডে ছিল অংক। অংক স্যার এক-দুইবার নূতন ছেলেটার দিকে তাকালেন। একবার মনে হয় কিছু জিজ্ঞেসও করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নূতন ছেলেটা তার কথা না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। অংক স্যার তাকে আর ঘাঁটালেন না। এর পরের পিরিয়ডে বিজ্ঞান ক্লাস, বিজ্ঞান ক্লাস নেন মান্নান স্যার। মান্নান স্যার মানুষটা খুব ভালো, স্যারের ক্লাসগুলোকে আসলে ক্লাস বলেই মনে হয় না—মনে হয় স্যার আমাদের সাথে গল্পগুজব করছেন। আমরা তাই আগ্রহ নিয়ে মান্নান স্যারের ক্লাসের জন্যে অপেক্ষা করি, আজকেও করছি। ঠিক তখন দরজা খুলে ক্লাসে মাথা ঢোকালেন গহর আলী স্যার। আমরা সবাই তখন একসাথে চমকে উঠলাম। সারা স্কুলের মাঝে সবচেয়ে খারাপ স্যার হচ্ছেন গহর আলী স্যার। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা বলে একাত্তর সালে গহর আলী স্যার নাকি রাজাকার ছিলেন, ঘাড়ে রাইফেল নিয়ে ব্রিজ পাহারা দিতেন। সেটা সত্যি না মিথ্যা আমরা জানি না কিন্তু এই মানুষটা যে ভালো না সেই বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই । এই স্যার আমাদের কোনো ক্লাস নেন না—ছোট ক্লাসে ইসলামিয়াত পড়ান। আমি একেবারে বাজি ধরে বলতে পারি গহর আলী স্যারের উৎপাতের কারণে ছোট ক্লাসের অনেক ছেলে বড় হয়ে হয় বৌদ্ধ না হলে খ্রিস্টান হয়ে যাবে। গহর আলী স্যারের চেহারাটা ইঁদুরের মতো, ক্লাসে ঢুকলেনও সেইভাবে। ঢুকে চুলুক-চালুক করে এদিক-সেদিক তাকালেন। তারপর চেয়ারে পা তুলে বসে কেনে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে কান চুলকাতে লাগলেন। ক্লাসের সবাই আমরা চুপ করে বসে বিরস মুখে গহর আলী স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গহর আলী স্যার একটা ঢেকুর তুলে বললেন, "তোদের মান্নান স্যার আজকে আসে নাই। বউয়ের শরীল খারাপ। ডাক্তারের কাছে নিছে।"

মান্নান স্যার আমাদের সবার প্রিয় স্যার। তার স্ত্রীর অসুখ শুনে আমাদের সবার একটু চিন্তা হল। কাজল বলল, "কী হয়েছে ওনার?"

গহর আলী স্যার আরেকটা ঢেকুর তুলে বললেন, "জানি না। মাইয়া লোকের কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে নাকি?"

গহর আলী স্যারের সাথে আমাদের ক্লাস হয় না, কোনো স্যার না থাকলে তাকে পাঠানো হয়। কিন্তু গহর আলী স্যার যতবার এসেছেন ততবার মেয়েদের সম্পর্কে

আজেবাজে কথা বলে গেছেন। কাজেই স্যারকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ হবে না, আজকে বাসায় যাবার সময় স্যারের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে যেতে হবে।

গহর আলী স্যার হঠাৎ সোজা হয়ে বসে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন। আমাদেরকে ভালো করে চেনেন না তাই এদিক-সেদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের ক্লাসে নূতন একটা পোলা আসছে না?"

আমরা একটু অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়লাম।

স্যার বললেন, "কেডা?"

আমরা নূতন ছেলেটার দিকে তাকালাম। সে তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। গহর আলী স্যার ধামকি দিয়ে বললেন, "হেই বান্দরের বাচ্চা, বাইরে কী দেখিস?"

ছেলেটা খুব আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে গহর আলী স্যারের দিকে তাকাল, তার মুখে কোনোরকম দুশ্চিন্তা বা ভাবনা নেই। বরং মনে হল চোখের মাঝে লুকানো এক ধরনের চাপা আনন্দ—যেন সামনে মুখ খিচিয়ে যে বসে তাকে গালাগালি করছে, সেটা গহর আলী স্যার না, সেটা যেন হাসির নাটকের একটা চরিত্র।

গহর আলী স্যার বললেন, "খাড়া।"

ছেলেটা দাঁড়াল না, টেবিলে দুইটা কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে গহর আলী স্যারের দিকে তাকাল। এখন তাকে দেখে মনে হতে থাকে পুরো ব্যাপারটাতে সে এক ধরনের মজা পেতে শুরু করেছে। গহর আলী স্যার তখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "খাড়া বলছি হারামজাদা। খাড়া।"

ছেলেটা তখন একটু ভুরু কুঁচকাল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল গহর আলী স্যার কী বলছেন সে বুঝতে পারছে না। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। গত বছর গহর আলী স্যার চড় মেরে ক্লাস টুয়ের একটা ছেলের কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চাপাগলায় ছেলেটাকে বললাম, "দাঁড়াও তাড়াতাড়ি।"

ছেলেটা আমার দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গহর আলী স্যার বললেন, "বেয়াদপ বদমাইশ বেতমিজ ছেলে, কথা কানে যায় না?"

ছেলেটা কোনো কথা বলল না। গহর আলী স্যার গর্জন করে বললেন, "চার কলমা জানিস? নাকি তাও জানিস না?"

ছেলেটা মুখটা একটু সুচালো করল, মনে হল কিছু একটা বলবে কিন্তু কিছু বলল না। গহর আলী স্যার তখন দাঁতমুখ খিচিয়ে বললেন, "তুই কি মুসলমানের বাচ্চা নাকি খিরিস্টানের বাচ্চা?"

ছেলেটা খুব হালকাভাবে একটু কাঁধ ঝাঁকাল এবং মনে হল তাতে হঠাৎ করে গহর আলী স্যারের মাথার মাঝে একেবারে আগুন ধরে গেল। চেয়ার থেকে ধড়মড় করে পা নামিয়ে একেবারে একটা পাগলা মোষের মতো ছেলেটার দিকে ছুটে আসতে লাগলেন। আর কী আশ্চর্য, আমার মনে হল সেটা দেখে ছেলেটার মুখে ভয়ভীতির বদলে একটা আনন্দের হাসি ফুটে উঠতে লাগল। গহর আলী স্যার কাছে এসে খপ করে ছেলেটার চুল ধরে ফেললেন—আমরা তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম আসলে ধরতে পারেন নি,

ছেলেটা শেষ মুহূর্তে মাথা নিচু করে ফেলেছে। গহর আলী স্যার এতে আরো রেগে উঠেছেন, তার পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো বের হয়ে এসেছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা পাগলা কুকুরের মতো। স্যার আবার ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার আগেই ছেলেটা তার ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটা লাফ দিয়ে সরে গেছে! আমরা অবাক হয়ে দেখলাম সে সোজা দরজার দিকে হাঁটছে। দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে তার ব্যাগ খুলে একটা খাম বের করল। খামটা হাতে নিয়ে সে তখন গহর আলী স্যারের কাছে এগিয়ে আসে—তারপর তার দিকে খামটা এগিয়ে দেয়।

ক্লাসের আমরা সবাই মুখ হাঁ করে অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটি দেখছি, মনে হচ্ছে এটা যেন ক্লাসরুম না, এটা যেন কোনো একটা নাটকের দৃশ্য। গহর আলী স্যার এতক্ষণ রেগে আগুন হয়ে ছিলেন, এখন হঠাৎ করে ছেলেটার কাজকর্ম দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ছেলেটা আরেকটু এগিয়ে এসে প্রায় স্যারের হাতে খামটা গুঁজে দিল। তারপর আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। আমি পরিষ্কার দেখলাম তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। এমনকি মনে হল সে শিস দিতে দিতে স্কুলের গেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

যখন মনে হল নূতন ছেলেটাকে যতটুকু আজব ভেবেছিলাম সে বুঝি তার থেকেও বেশি আজব!

কয়েক সেকেন্ড পুরো ক্লাস একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকল। তারপর হঠাৎ করে সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করল। গহর আলী স্যার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "চোপ। সবাই চোপ।"

আমরা সবাই চুপ করলাম। এখনো আমরা পুরো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছি না। গহর আলী স্যারের হাতে যে খামটা দিয়ে গেছে সেটাতে কী আছে জানার খুব কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সেটা মনে হয় জানতে পারব না। গহর আলী স্যার তার চেয়ারে আবার পা তুলে বসে নার্ভাস ভঙ্গিতে কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে শুরু করলেন। তারপর মুখ বিকৃত করে বিড়বিড় করে নিচুগলায় কী যেন বললেন, মনে হল ছেলেটাকে গালিগালাজ করছেন। গালিগালাজ করতে করতে স্যার খামটা খুলে একটা কাগজ বের করলেন। আমরা দেখলাম সেটাতে ইংরেজিতে কিছু কথা লেখা। স্যার কাগজটার দিকে তাকালেন, তার চোখেমুখে কেমন যেন যন্ত্রণার ভাব ফুটে উঠল। আমরা বুঝতে পারলাম স্যার ইংরেজি ভালো জানেন না বলে চিঠিটা পড়তে পারছেন না। খানিকক্ষণ কাগজটা নাড়াচাড়া করে একটা ঢোক গিলে বললেন, "চশমাটা ফেলে এসেছি! তোরা কেউ একজন একটু পড়, দেখি কী লেখা দিয়ে গেছে পাজি ছেলেটা।"

অন্য কেউ ওঠার আগে আমি তিন লাফ দিয়ে স্যারের কাছে হাজির হলাম, কাগজটা হাতে নিয়ে বললাম, "পড়ব স্যার?"

"পড় দেখি।" গহর আলী স্যারের গলাটা হঠাৎ কেমন যেন দুর্বল শোনায়।

আমি তখন কাগজটা পড়তে শুরু করি—এটা ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি, চিঠিটা এরকম :

যার জন্যে এটা প্রযোজ্য

আপনি আমার ছেলে তারিক আজাদকে শারীরিকভাবে আঘাত করার চেষ্টা করছেন, এটি আপনাদের স্কুল এবং দেশের আইনের পরিপন্থী একটি কাজ। আমার ছেলের শরীরে আঘাত দেওয়ার আপনার কোনো অধিকার নেই।

কিন্তু যেহেতু আপনি এই অন্যায় কাজটি করতে উদ্যত হয়েছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার ছেলে তারিক আজাদকে আপনার স্কুল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে নিচ্ছি। তারিক আজাদ আর আপনার স্কুলের ছাত্র নয়। তার ওপরে আপনার কিংবা আপনাদের স্কুলের কারো কোনো অধিকার নেই। সে এখন স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবে।

বিনীত

রুখসানা আজাদ

চিঠিটা যেহেতু ইংরেজিতে লেখা তাই গহর আলী স্যারকে সেটা অনুবাদ করে শোনাতে হল। আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা শুনে স্যার বুঝি রেগে আগুন হয়ে যাবেন কিন্তু আমি দেখলাম স্যার কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। এমনিতেই তার চেহারা ইঁদুরের মতো, এখন তাকে কেমন যেন নেংটি ইঁদুরের মতো দেখাতে লাগল। গহর আলী স্যার কেমন যেন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, "এই মাইয়ালোক বুঝল কেমন করে?"

আমি সাহস করে বলে ফেললাম, "বুঝেন নাই স্যার—"

"তা হলে আগে থেকে লিখল কেমন করে?"

"যদি কেউ কোনোদিন মারার চেষ্টা করে—সেইজন্যে আগে থেকে লিখে দিয়েছেন।"

গহর আলী স্যার কেমন যেন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তার চোখটা ঠিকমতো পাকাল না, কেমন যেন ভীতু ভীতু হয়ে থাকল। গহর আলী স্যার চেয়ার থেকে পা নামিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে কেমন জানি বিচিত্র একটা ভঙ্গিতে বসে থেকে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, "আচ্ছা—তোরা সবাই সাক্ষী। তোরা বল এই ছেলে আগে আমার সাথে বেয়াদপি করে নাই?"

আমরা সবাই ঠোঁট চেপে রেখে মুখ শক্ত করে বসে রইলাম। গহর আলী স্যার আবার বললেন, "করে নাই বেয়াদপি?"

আমরা ছেলেটাকে এমন কিছু বেয়াদপি করতে দেখি নি, একটু পাগলামো হয়তো করেছে কিন্তু সেটাকে তো বেয়াদপি বলা যায় না। তাই স্যার যখন আমাদের চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন আমরা তখন আমাদের চোখ সরিয়ে নিতে লাগলাম। গহর আলী স্যার তখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বানান করে করে চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোরা বল আমি কি পোলাডারে মেরেছি?"

আমরা চুপ করে রইলাম।

স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মেরেছি?"

কাজল সাহস করে বলল, "জি না স্যার, মারার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মারতে পারেন নাই।"

স্যার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, "কোন সময় আমি মারার চেষ্টা করলাম?"

আমরা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। গহর স্যার চিঠিটা হাতে নিয়ে ক্লাসে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন তারপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন ছেলেটাকে কোথাও দেখা যায় কি না। মনে হয় কিছু দেখতে পেলেন না। তখন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আসলে আমি কি মারতাম? কোনোদিন মারতাম না। খালি একটু ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। তাই না রে? তোরা সব সাক্ষী!"

আমরা এবারেও কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। স্যারের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হল না, এই সব ব্যাপারে স্যারের অতীত ইতিহাস একেবারেই ভালো না। আমরা এক ধরনের মধুর আনন্দ নিয়ে গহর আলী স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম—এই পাজি মানুষটা মনে হয় আচ্ছা একটা ভয় পেয়েছে। স্যার চিঠিটা টেবিলে ডাস্টার দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে সেটার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন এটা একটা বিষাক্ত সাপ! তখন গহর আলী স্যার ক্লাসের মাঝে হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করলেন। তাকে এখন দেখে সত্যিকার একটা খাঁচার মাঝে আটকে থাকা ইঁদুরের মতো মনে হতে লাগল। একটু পরে পরে স্যার দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিতে লাগলেন। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যেন তার ভয় হচ্ছে ছেলেটা এখনই পুলিশ আর বি.ডি.আর. নিয়ে হাজির হবে; তারপর স্যারের দুই হাত পিছনে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। গহর আলী স্যারের অবস্থা দেখে আনন্দে আমাদের সবার বুক ভরে গেল।

গহর আলী স্যার ছটফট করতে করতে একসময় আবার আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। স্যার মনে হয় সারা জীবনে কোনোদিন হাসার চেষ্টা করেন নি, কারণ যখন চেষ্টা করলেন তখন তাকে এমন ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল যে ভয়ে আমাদের আত্মা শুকিয়ে গেল। স্যার অবিশ্যি সেটা টের পেলেন না, হাসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আর শিক্ষক যদি ছাত্রদেরকে একটু শাসন করে সেইটা কি কোনো দোষের হতে পারে? ছাত্ররা হচ্ছে শিক্ষকদের সন্তানের মতো। সন্তানকে কি একটু শাসন করে না তাদের বাবা-মায়েরা?"

আমরা মুখ টিপে বসে রইলাম। চড় মেরে ক্লাস টুয়ের যে ছেলেটার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন সেই ছেলেটাকে কি গহর আলী স্যার নিজের সন্তানের মতো দেখেছিলেন?

পুরো ব্যাপারটার মাঝে আমরা তখন এক ধরনের মজা পেতে শুরু করেছি। স্যারের এই কাচুমাচু অবস্থা দেখে আমাদের সাহসও অনেক বেড়ে গেছে। তা ছাড়া ছেলেটা বাইরে দাঁড়িয়ে কী করছে সেটা খুব জানার ইচ্ছা করছিল। আমি বললাম, "স্যার আমি কি ছেলেটাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আসব?"

গহর আলী স্যার মনে হল আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলেন। গোল গোল চোখ করে বললেন, "পারবি তুই? বাবা তুই পারবি?"

আমি উদাস উদাস মুখ করে বললাম, "চেষ্টা করে দেখতে পারি—তবে এখন ছেলেটা কোথায় আছে, তারে খুঁজে পাব কি না সেটাই হয়েছে সমস্যা!"

"কোথায় আর যাবে?" গহর আলী স্যার হড়বড় করে বললেন, "এই গেইটের কাছেই নিশ্চয়ই আছে। যা তুই—তাড়াতাড়ি যা।"

আমি তখন ক্লাস থেকে বের হলাম। ডান দিকে লাইব্রেরি বিল্ডিং, তার পাশ দিয়ে রাস্তাটা স্কুলের গেটের দিকে গিয়েছে। আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম ছেলেটা স্কুলের দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। স্কুলের গেটে সব সময় স্কুলের দারোয়ান জব্বার ভাই থাকেন—এখন ক্লাস হচ্ছে, কেউ যাচ্ছে-আসছে না বলে মনে হয় গেটে নেই, মনে হয় বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্যে কোথাও গিয়েছেন। আমি গেট ফাঁক করে বাইরে এসে ছেলেটার কাছে দাঁড়ালাম। ছেলেটা আমাকে দেখে ভালোমানুষের মতো হাসল। আমি বললাম, "এই যে শোন—ইয়ে মানে—তুমি—ইয়ে, মানে তোমার নাম তো তারেক, তাই না?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "হুঁ। ট্যাড়েক।"

এই প্রথম ছেলেটা একটা কথা বলল, কী বিচিত্র তার উচ্চারণ! তারেক কথাটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না, বলে ট্যাড়েক। কী আশ্চর্য! আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "তুমি সত্যিই স্কুল থেকে চলে যাবে?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন গেটের সামনে একটা লাল গাড়ি এসে থামল। ছেলেটা সাথে সাথে দেওয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। গাড়ির দরজা খুলে একজন খুব টিশটাশ ভদ্রমহিলা বের হলেন। ভদ্রমহিলার চোখেমুখে এক ধরনের দুশ্চিন্তার ছাপ। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, তুই ফোন করেছিস কেন?"

ছেলেটার চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করতে থাকে। ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে সে হাত-পা নেড়ে কথা বলতে শুরু করে, আর সেই কথা শুনে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। একটা শব্দও বাংলায় বলছে না, একেবারে ঝড়ের গতিতে ইংরেজিতে কথা বলছে। সেই কথার উচ্চারণ একেবারে ইংরেজি সিনেমার নায়কদের মতো। সাদিব শুনতে পেলে মনে হয় হিংসায় একেবারে হার্টফেল করে মরে যাবে। ছেলেটা এত তাড়াতাড়ি এত বিদেশী উচ্চারণে কথা বলে গেল যে, আমি তার একটা শব্দও বুঝতে পারলাম না। ছেলেটার কথা শুনতে শুনতে ভদ্রমহিলার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। নিশ্বাস আটকে বললেন, "তারপর কী হল?"

এইবারে ছেলেটা হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলতে শুরু করল, তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম সে গহর আলী স্যারের কাজকর্মের কথা বলছে। তার একটা-দুইটা শব্দ ছাড়া আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু তবু আমার ধারণা হল সে গল্পটা অনেক বাড়িয়ে-চাড়িয়ে করছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে গহর আলীর কথা বলছে না—বাঘ-সিংহ বা সেরকম কোনো হিংস্র প্রাণীর কথা বলছে। ভদ্রমহিলা প্রায় নিশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "সর্বনাশ!" তারপর সাবধানে একটা নিশ্বাস বের করে বললেন, "ক্লাসের ছেলেরা কিছু বলল না?"

ছেলেটা তখন ঠোঁট উল্টে হাত নেড়ে ক্লাসের ছেলেদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলল যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে খুব খারাপ কিছু বলেছে। তার ভঙ্গিটা দেখেই বোঝা

গেল সে বলছে, "ক্লাসের ছেলে? তাদের কথা ছেড়ে দাও। ছেলেগুলি অপদার্থ আলসের ডিম। ভীতু আর কাপুরুষ। স্বার্থপর আর নির্বোধ। আমার জন্যে কোনো মায়াদয়া নেই। আমাকে যে খুন করে ফেলছে সেটা নিয়ে কারো কোনো চিন্তা নেই! সবাই হাঁ করে তাকিয়ে মজা দেখছে—"

আমার পক্ষে তখন সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। আমি দুই পা এগিয়ে বললাম, "মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে কথা।"

ভদ্রমহিলা এবং ছেলেটা দুজনেই আমার কথা শুনে একেবারে চমকে উঠল। ছেলেটা আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল কিন্তু ভদ্রমহিলা তাকালেন খুব অবাক হয়ে। চোখ কপালে তুলে বললেন, "তু-তু-তুমি কে?"

আমি ছেলেটাকে দেখিয়ে বললাম, "আমি ওর ক্লাসে পড়ি।"

"তারেকের ক্লাসে পড়?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বাইরে কী করছ? এখন তোমাদের স্কুল হচ্ছে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হচ্ছে।"

"তা হলে?"

"ও তো আপনার চিঠি দিয়ে বের হয়ে এসেছে—এখন একা একা কী করে সেটা দেখতে এসেছি।"

"তোমার স্যার? তোমার স্যার আপত্তি করেন নাই?"

"নাহ্!" আমি একগাল হেসে বললাম, "আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভয় পেয়েছেন তো সেইজন্যে আপত্তি করেন নাই।"

"ভয় পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

তারেক নামের ছেলেটা আবার ঠাস ঠাস করে ইংরেজিতে কী বলে ফেলল আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কী বলেছ?"

ছেলেটা মুখ গোঁজ করে বলল, "নাথিং।" মনে হয় সে বাংলাতে কথাই বলতে পারে না।

আমি বললাম, "একটু আগে আপনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন না তার ক্লাসের ছেলেরা কী করে তখন সে আমাদের বিরুদ্ধে একশ'টা কথা বলেছে না?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "না মানে ইয়ে—"

আমি বললাম, "সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। মিথ্যা কথা বলেছে।"

ছেলেটা রাগে গরগর করে আবার কী সব বলে ফেলল। আমি তার কথায় কোনো কান না দিয়ে তার মাকে বললাম, "সে তিন দিন হল স্কুলে এসেছে। এই তিন দিনে আমাদের কারো সাথে একটা কথাও বলে নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে জিজ্ঞেস করে দেখেন—সে আমাদের সাথে একটা কথাও বলেছে কি না।"

ভদ্রমহিলা একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "আসলে মাত্র আমেরিকা থেকে এসেছে তো—বাংলা ভালো করে বলতে পারে না। সেইজন্যে বলতে চায় না—"

"আমাদের জহুরের বাড়ি নেত্রকোনা—সেও ভালো করে বাংলা বলতে পারে না। চোরকে বলে চুর, পোকাকে বলে পুকা—সে কি কথা বলে না?"

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা ফিক করে হেসে ফেললেন, বললেন, "সেটা আর তারেকের ব্যাপার তো এক হল না—"

"না খালাম্মা—একই ব্যাপার।" এরকম টিশটাশ ইংরেজি জানাওয়ালা ছেলের মাকে খালাম্মা ডেকে ফেললাম। মনে হয় আন্টি-ফান্টি কিছু ডাকা উচিত ছিল কিন্তু ইংরেজি শব্দ আমার মুখে আসতে চায় না। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "তারেকের আমাদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল, তা হলে এই তিন দিনে তার তিরিশ জন বন্ধু থাকত। সে একটা কথা তো বলেই নাই, যখন আমরা চেষ্টা করেছি তখন একটা আঙুল—"

তারেক কীভাবে মাঝখানের আঙুলটা পতাকার মতো তুলে আমাদের দিকে খারাপ একটা ইঙ্গিত করেছিল সেটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তারেক নামের ছেলেটার মুখ হঠাৎ করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খপ করে আমার হাত ধরে ফেলে অনুনয়ের ভঙ্গি করে আমার দিকে তাকাল যেন আমি কথাটা না বলি। ছেলেটা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। তার মায়ের কাছে আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই একেবারে যা-তা বলেছে। তাকে একটা উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্যে ব্যাপারটা একেবারে খোলাসা করে বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তাকে মাপ করে দিলাম, হাজার হলেও আমাদের বয়সী ছেলে—বড় মানুষদের যন্ত্রণায় আমাদের এমনিতেই অশান্তির শেষ নাই, নূতন করে আর যন্ত্রণা বাড়িয়ে কী হবে?

টিশটাশ ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী করেছে আঙুল দিয়ে?"

"কান চুলকেছে" আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমরা যখন তাকে একটা প্রশ্ন করি সে তখন এমনি করে কানের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে কান চুলকায়—" ব্যাপারটাকে আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে কেনে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে কান চুলকিয়ে দেখালাম।

ভদ্রমহিলা মুখটা বিকৃত করে তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কোন ধরনের নোংরামি? তুই পাবলিকলি কানে আঙুল ঢুকিয়ে কান চুলকাস? কোনদিন শুনব নাক খুঁটতে শুরু করেছিস। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

তারেক নামের ছেলেটা মায়ের বকাবকিটা বেশ হাসিমুখেই মেনে নিল এবং এর মাঝে এক ফাঁকে চোখের কোনা দিয়ে সত্যি কথাটা বলে না দেবার জন্যে আমাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফেলল। আমি বললাম, "আপনি বলেন খালাম্মা—এই কাজটা কি সে ঠিক করেছে? আমাদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল না? আমাদের ক্লাসে পড়বে আর আমাদের সাথে কথা বলবে না—এটা কি হতে পারে?"

তারেক এই প্রথমবার বাংলায় বলল, "আমি বাংলায় কঠা বলটে পাড়ি না।" তার উচ্চারণটা এত আজব যে আরেকটু হলে হাসিতে আমার পেট ফেটে যেত। আমি বেশ কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে বললাম, "এইতো বলতে পার।"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "না। পাড়ি না।"

"না পারলে শিখবে।"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ শিখবি।"

ছেলেটা মুখ গম্ভীর করে ইংরেজিতে কিছু একটা কথা বলল, তাকে কিছু একটা কথা দেওয়া হয়েছিল এখন সেই কথা রাখতে হবে এরকম কোনো বিষয়, আমি ঠিক ধরতে

পারলাম না। ভদ্রমহিলা নরম গলায় বললেন, "হ্যাঁ, তোকে কথা দিয়েছিলাম, কেউ তোর গায়ে হাত তুললে তোকে আর সেই স্কুলে যেতে হবে না—কিন্তু—" ভদ্রমহিলা ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললাম—"না খালাম্মা, না—"

"কী না?"

"গহর আলী স্যারের বিষয়টা আলাদা। এই স্যার আমাদের কোনো ক্লাস নেন না। স্যার মানুষটা আসলে—" একজন স্যারের বিরুদ্ধে কিছু বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলাম না, একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললাম, "এই স্যার মানুষটা খুব খারাপ। আগে রাজাকার ছিলেন।"

"রাজাকার?" ভদ্রমহিলা রীতিমতো আঁতকে উঠলেন।

"হ্যাঁ, সুযোগ পেলেই ছেলেদের পিটান। এই জন্যে এই স্যারের ক্লাসে খুব সাবধান থাকতে হয়। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তারেক সাবধান তো থাকেই নাই—উল্টা চেষ্টা করেছে স্যারকে রাগিয়ে দিতে। ইচ্ছে করে করেছে—"

তারেক চোখ পাকিয়ে বলল, "না কড়ি নাই। আমি কড়ি নাই।" ছেলেটার উচ্চারণ এত আজব যে আবার আমার পেটের ভিতরে হাসি গুড়গুড় করে উঠল, অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে রাখলাম। মুখ গম্ভীর করে বললাম, "করেছ। পুরা ক্লাস সাক্ষী। খালাম্মা আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে এখনই চলেন আমার সাথে, অন্যদের জিজ্ঞেস করবেন।"

আমি যখন এরকম কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম তখন তারেক আর কিছু বলতে পারল না, মুখ ভোঁতা করে গজগজ করতে লাগল। আমি বললাম, "একেবারে যে কখনো স্যারেরা পিটাবে না সেই গ্যারান্টি নাই। কিন্তু একটু চোখকান খোলা রাখলে এত ভয় নাই। আর—" আমি মুখটা একটু উদাস উদাস করে বললাম, "জীবনে বেঁচে থাকতে হলে কিছু মার আর পিটুনি তো খেতেই হয়। তাই না খালাম্মা?"

খালাম্মা মনে হয় আমার কথাটা পুরোপুরি মানতে রাজি হলেন না। আমতা-আমতা করে বললেন, "তা মানে ইয়ে—আমার মনে হয়—"

আমি বললাম, "কোনো সময় স্যারেরা মারে, কোনো সময় ক্লাসের বদ ছেলেরা মারে—কোনো সময় বাসায় বাবা-মা মারে—"

খালাম্মা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—মনে হল মার খাওয়ার ব্যাপারটা আমার মতো এরকম সহজভাবে নিতে পারলেন না। তাই আমি আর সেই লাইনে চেষ্টা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "তারেক কি তা হলে আর আসবে না?"

তারেক মুখ শক্ত করে বলল, "নো। নেভার—"

খালাম্মা কেমন যেন মুখ কাচুমাচু করে বললেন, "কিন্তু—"

আমি বললাম, "আমার কী মনে হয় জানেন?"

"কী?"

"তারেক আরেক সপ্তাহ চেষ্টা করে দেখুক।"

খালাম্মার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "হ্যাঁ, তারেক। তুই আরেক সপ্তাহ চেষ্টা করে দেখ—এখন তো ব্যাপারটা একটু বুঝতে পেরেছিস!"

তারেক মুখ শক্ত করে বলল, "নো। নেভার।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "এইটা ঠিক হল না।"

তারেক বলল, "কোনটা?"

"এই যে তুমি আমাদের সবার সম্পর্কে এরকম একটা খারাপ ধারণা নিয়ে চলে যাচ্ছ। আমরা কি এত খারাপ?"

তারেক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "তোমার ধারণা শুধু তোমার আমেরিকার ছেলেরা ভালো?"

তারেক ইতস্তত করে বলল, "নো—আমি টো সেটা বলি নাই।"

"তা হলে আর এক সপ্তাহ চেষ্টা কর।"

খালাম্মা খুব আশা নিয়ে বললেন, "করবি বাবা?"

তারেক কোনো কথা না বলে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। খালাম্মা বললেন, "তোর আব্বুর কথাটা ভেবে দেখ—"

তারেক হঠাৎ মাথা নেড়ে ইংরেজিতে কী যেন বলল, কথাটা একইসাথে দুঃখ এবং অভিমানের কিন্তু কী বলল ধরতে পারলাম না। খালাম্মা তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারেকও তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর দুইজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, মনে হল তারেকের বাবাকে নিয়ে কিছু একটা ব্যাপার আছে। এখন সেটা জিজ্ঞেস করা মনে হয় অভদ্রতা হবে, আমি তাই আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

তারেক তার মায়ের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ও কে।" তারপর ইংরেজিতে বলল, "আমি আর এক সপ্তাহ শেষবার চেষ্টা করব। যদি কাজ না করে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।"

আমি মনে হল তার ইংরেজিটাও বুঝে ফেলতে শুরু করেছি! খালাম্মা খুশি হয়ে বললেন, "এই তো চাই! বাঘের বাচ্চার মতো কথা। এক সপ্তাহ চেষ্টা করে দেখ।"

আমি বললাম, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না খালাম্মা। আমরা ক্লাসের সবাই মিলে তারেকের ব্যবস্থা করে দিব। তার কোনো সমস্যা হবে না।"

খালাম্মা একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো খুশি হয়ে বললেন, "থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

কেউ থ্যাংক ইউ বললে উল্টো কিছু বলতে হয় কি না কে জানে, আমার সেটা জানা নেই বলে মুখটা হাসি হাসি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। খালাম্মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নামটা কী বাবা?"

"আমার নাম ইবু।"

"ইবু! হাউ সুইট! কী সুন্দর নাম!"

ইবু নামের মাঝে কোনটা সুন্দর কে জানে, পুরো নাম ইকবাল—সেটা শর্ট হয়ে ইবু হয়েছে—আমি এই নামটা একেবারে সহ্যই করতে পারি না। কিন্তু এখন তো আর সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যায় না, তাই আবার মুখটা হাসি হাসি করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারেক ইংরেজিতে তার মাকে বলল, "আমি কিন্তু আজকে আর ক্লাসে যাব না।"

খালাম্মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে ক্লাসে না গেলে কোনো অসুবিধে হবে?"

আমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যেন আমি একটা বড় মানুষ আর আমি কী বলি তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। আমি তাই বড় মানুষের মতো ভাব করে বললাম, "নাহ্! অসুবিধা হবে না মনে হয়। আর যদি কোনো অসুবিধা হয় আমি স্যারদের বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করব।"

"থ্যাংক ইউ ইবু। থ্যাংক ইউ।" বলে খালাম্মা তারেককে নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন। তারা যতক্ষণ চলে না গেল আমি ততক্ষণ গেটে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গেটের বাইরে থেকে স্কুলের ভেতরে ঢোকার সময় জব্বার ভাই আমাকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি বাইরে কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি খুব গম্ভীর গলায় বললাম, "একটা জরুরি কাজে গিয়েছিলাম।"

"তুমি জান না স্কুলের টাইমে বাইরে যাওয়া নিষেধ? হেডস্যারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।"

আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, "চলেন তা হলে যাই! আমি যখন বাইরে যাচ্ছিলাম তখন গেটটাতে কেন আপনি ছিলেন না সেইটা বলতে পারবেন তো? গহর আলী স্যারকেও সাথে নিতে হবে।"

"কেন? গহর আলী স্যারকে কেন?"

"গহর আলী স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন তো সেইজন্যে!"

"অ।" জব্বার ভাই বললেন, "সেইটা তো আগে বলবে! যাও।"

আমি ক্লাসে ফিরে এলাম। এতক্ষণে মনে হল গহর আলী স্যারের মুখটা আরো চিমসে মেরে গেছে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "কী হল? বুঝাতে পারলি?"

আমি মুখটা গম্ভীর করে বললাম, "অনেক চেষ্টা করেছি স্যার। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিছুতেই বুঝতে চায় না। মা'কে মোবাইল করে দিয়েছিল, সাথে সাথে তার মা এসেছিলেন নিতে।"

"এতটুকু ছেলের মোবাইল আছে?"

"মোবাইল কী বলেন স্যার, মনে হয় ল্যাপটপও আছে।"

"ল্যাপটপ কী?"

"ছোট কম্পিউটার। ব্যাগের ভিতরে নিয়ে ঘুরে।"

"অ।" গহর আলী স্যার ব্যাপারটা বুঝলেন বলে মনে হল না। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তা, মা কী বলল?"

"সবকিছু দেখে খুব রেগে গেলেন মনে হল।"

"রেগে গেলেন?"

"জি স্যার। মনে হয় পুলিশ-মিলিটারির সাথে যোগাযোগ আছে। গেটে থেকেই একটা মোবাইল করে দিলেন।"

গহর আলী স্যারের মুখটা কেমন জানি লম্বা হয়ে গেল। মিথ্যা কথা বললে পাপ হয়—বেহেশতে নাকি যাওয়া যায় না। কিন্তু রাজাকারদের টাইট দেওয়ার জন্যে একটু-আধটু মিথ্যা কথা বললে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মাপ করে দিবেন। গহর আলী স্যার ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, "কী বলেছে মোবাইলে?"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার। সব ইংরেজিতে বলেছেন তো। টানা ইংরেজি।"

"অ।"

"মনে হল আসতে বলেছেন।"

"আ-আসতে বলেছে?"

"জি স্যার।"

"আর কিছু বলেছে?"

"বারবার আমার কাছে একটা জিনিস জানতে চেয়েছেন।"

"কী জিনিস?"

আমি উদাস উদাস মুখ করে বললাম, "আপনি আগেও অন্য কাউকে শাস্তি দিয়েছেন কি না।"

"তুই কী বলেছিস?"

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

গহর আলী স্যার ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, "কী বলেছিস?"

"বলেছি, স্যার তো আমাদের ক্লাস নেন না। তবে—"

"তবে?"

"ক্লাস টুয়ে ধর্ম ক্লাস নেন। সেইখানে শুনেছিলাম—"

গহর আলী স্যারের চোয়াল ঝুলে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, "কী শুনেছিলি?"

"একটা ছেলের কানের পর্দা নাকি ফেটে গিয়েছিল।"

"তু-তু-তুই সেটা বললি?"

"আমি বলতে চাই নাই স্যার।" আমি মুখে একটা কাচুমাচু ভাব এনে বললাম, "কিন্তু খুব জোর করল, তখন বলতে হল স্যার। দেখে মনে হল খুব হাইফাই ফেমিলি। সত্যি কথা না বললে যদি বিপদ হয়।"

গহর আলী স্যার তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে রইলেন। যতবার রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাবার শব্দ হল গহর আলী স্যার চমকে চমকে উঠতে লাগলেন।

স্যারের অবস্থা দেখে আনন্দে আমার বুকটা ভরে গেল। এতদিন পরে তার একটা উচিত শাস্তি হচ্ছে।

যখন নূতন ছেলেটার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্যে একটা পরিকল্পনা করার পরেও পরিকল্পনা প্রায় ভেস্তে যাবার অবস্থা হল।

বিকালবেলা আমি আর জয়ন্ত মান্নান স্যারের বাসায় গেলাম। স্যারদের বাসায় যাওয়া ঠিক না, কোনো ছেলে কখনো যায় না। কেন যাবে? কেউ কি ডাক্তারের বাসায় যায়? দারোগার বাসায় যায়? তা হলে স্যারদের বাসায় কেন যাবে? তবে মান্নান স্যারের কথা আলাদা। মান্নান স্যার মানুষটা একেবারেই স্যারদের মতো না। স্যারের স্ত্রীর অসুখ শুনে আমাদের মনটা খচখচ করছিল।

স্যারের বাসার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর স্যার নিজেই দরজা খুলে দিলেন। আমাদের দুইজনকে দেখে স্যারের মুখে হাসি ফুটে উঠল, স্যার বললেন, "আরে কী আশ্চর্য। আমাদের কবি আর সায়েন্টিস্ট দেখি একসাথে! কী ব্যাপার?"

জয়ন্ত যে কবি সেটা স্কুলের সবাই জানে। সে ছদ্মনামে বড়দের কবিতা লিখে পত্রিকা অফিসে পাঠায়। কবিতার বিষয়বস্তু বড়রা জানতে পারলে সে শক্ত পিটুনি খাবে বলে ছদ্মনাম ব্যবহার করে। তবে সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমার তত বেশি নাম নেই। ক্লাস সেভেনে থাকার সময়, বাঁশের চোঙের ভিতর অনেকগুলি ম্যাচের কাঠি ভরে একবার রকেট তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম। রকেটটা উপরে না উঠে বিকট শব্দ করে ফেটে গিয়েছিল। সেইবার আমার ভুরু আর সামনের কিছু চুল পুড়ে গিয়েছিল। তখন সায়েন্টিস্ট হিসেবে একটু নাম হয়েছিল। এতদিনে সবাই সেটা ভুলে গেলেও মান্নান স্যার ভোলেন নি, মাঝে মাঝেই আমাকে সায়েন্টিস্ট ডাকেন। মান্নান স্যার বললেন, "এস। এস, ভেতরে এস।"

আমি আর জয়ন্ত ভিতরে ঢুকলাম। অন্য কোনো স্যার হলে কী নিয়ে কথা বলব, কীভাবে কথা বলব সেটা নিয়ে অনেক সমস্যা হত কিন্তু মান্নান স্যারের সাথে আমাদের সেইটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। আমি বললাম, "স্যার, আজকে আপনি ক্লাসে আসেন নাই—গহর আলী স্যার বললেন ম্যাডামের অসুখ তাই একটু খবর নিতে এসেছি!"

মান্নান স্যার বললেন, "হাউ নাইস! থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে তোমরা খবর নিতে এসেছ!"

জয়ন্ত বলল, "স্যার, ম্যাডামের শরীর কি এখন ভালো আছে?"

মান্নান স্যার মুচকি হেসে বললেন, "আসলে তোমার ম্যাডামের শরীর কখনো খারাপ হয় নি।"

"তা হলে স্যার?"

"শি ইজ এক্সপেকটিং।"

আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না, এক্সপেক্ট করা মানে আশা করা, ম্যাডাম কাকে আশা করছেন? তা ছাড়া কাউকে আশা করলে মানুষ ডাক্তারের কাছে যাবে কেন? স্যার আমাদের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন আমরা বুঝতে পারি নি। তখন হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, "তোদের ম্যাডামের বাচ্চা হবে।"

"ও!" আমি আর জয়ন্ত একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ একসময় ছোট বাচ্চা হয়ে জন্ম নিয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষের একজন করে মা আছে, বাচ্চা জন্মানোর ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার কিন্তু ঠিক কী কারণ জানি না সবাই দেখি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায়। আমাদের ছোট খালার যখন বাচ্চা হবে তখন সেটা নিয়ে যখনই আলোচনা হত আমরা কেউ থাকলে আমাদের ধমক দিয়ে বের করে দেওয়া হত। বড়রা বলত, "ছোটরা এখানে কেন? এটা কি বাচ্চাদের শোনার জিনিস?" মান্নান স্যার হচ্ছেন এর একমাত্র ব্যতিক্রম, নিজের থেকে বলে দিলেন। শুধু বলেই থামলেন না, ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিলেন, "যখন একজন মায়ের বাচ্চা হওয়ার সময় হয় তখন শরীরে নানারকম হরমোন তৈরি হয়, এই নূতন নূতন হরমোনের জন্যে মায়েরা খেতে পারে না, বমি হয়ে যায়—এরকম নানা ঝামেলা হয়। এই জন্যে ডাক্তারের কাছে চেকআপ করাতে হয়—" বলতে বলতে হঠাৎ করে স্যার থেমে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

"তোদের ম্যাডামের ডাক্তারের কাছে গিয়ে সেখানে তোর ডাক্তারের সাথে দেখা হয়ে গেল!"

আমি বললাম, "আ-আ-আমার?"

"হ্যাঁ।" মান্নান স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "ডাক্তার সাহেব বললেন, তোর নাকি কী একটা ফোড়া অপারেশন করেছেন। কোথায় হয়েছিল ফোড়া?"

এত কষ্ট করে পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করছি আর এখন সেটা এভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে? লজ্জায় আমার মুখ লাল নীল বেগুনি হতে শুরু করল। স্যার সেটা দেখে মনে হয় আসল ব্যাপার আন্দাজ করে ফেললেন। কথা ঘুরিয়ে বললেন, "ভালোই হয়েছে ফোড়াটা কাটিয়ে নিয়েছিস, খুব যন্ত্রণা হয় তা না হলে। তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম। জয়ন্ত আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল, ফোড়াটার কথা জিজ্ঞেস করবে বলে মনে হল। আমি তাই তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বললাম, "স্যার, আমাদের ক্লাসে আমেরিকা থেকে একটা ছেলে এসেছে।"

স্যার মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। জানি। ছেলেটার মা এসে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। ভালো বাংলা জানে না বলে একটু দেখেশুনে রাখতে বলেছেন।"

আমি এবং জয়ন্ত একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম। যে জিনিসটা এত কষ্ট করে আমাদের জানতে হয়েছে সেই জিনিসটা স্যারেরা আগে থেকেই জানেন? কেউ একজন আমাদের সেটা বলে দিলেন না কেন? তা হলেই তো আর এত ঝামেলা হত না। আমাদের মুখ দেখে স্যারের কিছু একটা সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু হয়েছে নাকি?"

আমরা তখন স্যারকে সবকিছু বলতে শুরু করলাম, কীভাবে ছেলেটা আমাদের সাথে একটা কথাও বলে নি, কীভাবে গহর আলী স্যারকে খেপিয়ে দিয়েছে, তারপর যখন স্যার মারতে গিয়েছেন তখন কীভাবে ছেলেটা গহর আলী স্যারের হাতে তার মায়ের চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে গেছে, তারপর আমি কীভাবে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর এক সপ্তাহ চেষ্টা করার জন্যে রাজি করিয়েছি— সবকিছু স্যারকে খুলে বললাম। একেবারে 'সবকিছু' খুলে বললাম সেটা অবিশ্যি পুরোপুরি ঠিক না, গহর আলী স্যারকে কীভাবে একটু মিথ্যে কথা বলে ভয় দেখিয়েছি সেইটা আর বললাম না! কিছু কিছু জিনিস বড় মানুষদের জেনে কোনো লাভ নেই।

স্যার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, এখন কী করা যায়?"

"কীসের কী করা যায়?"

"এই ছেলেটার ব্যাপারে। যদি এক সপ্তাহ থেকে তার ভালো না লাগে—যদি আমেরিকা ফিরে চলে যায়?"

স্যার হাসলেন, বললেন, "চলে গেলে কী আর করবি? চলে যাবে।"

"কিন্তু স্যার আমাদের একটা প্রেস্টিজ নাই? আমাদের ভালো লাগছে না বলে চলে যাচ্ছে! আমাদের কী একটা লজ্জা হবে না?"

স্যার ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালেন, বললেন, "প্রেস্টিজ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা?"

আমরা মাথা নাড়লাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী করব স্যার আমরা?"

স্যার একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ছেলেটাকে নিয়ে তার মা কেন চলে এসেছে জানি না। কিন্তু চলে যখন এসেছে তারা নিশ্চয়ই থাকার চেষ্টা করবে। তোরা যদি তার ভালো বন্ধু হিসেবে থাকিস—"

"ভালো বন্ধু কেমন করে হয়?"

"সে কী! তোরা বাচ্চাকাচ্চা মানুষ—ভালো বন্ধু কেমন করে হয় সেটা তোরা বলবি। আমি কেমন করে বলব?"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আমরা কি সব সময় তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি করে ভদ্রভাবে কথা বলব?"

স্যার হা হা করে হেসে বললেন, "তোদের এত চিন্তা করার কিছু নেই। হিসেব করে, গবেষণা করে, চিন্তাভাবনা করে প্ল্যান করে বন্ধুত্ব হয় না। যদি তোদের ভেতরে ক্লিক করে যায় তা হলেই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে দেখিস। আর ক্লিক যদি না করে—"

এরকম সময় ম্যাডাম একটা ট্রেতে করে শিঙ্গাড়া আর লাড্ডু নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। শুধু যে মান্নান স্যারের জন্যে আমরা এখানে আসি সেটা সত্যি নয়, মাঝে মাঝে ম্যাডামের জন্যেও আসি। ম্যাডাম বলতে অবিশ্যি আমরা শুধু ম্যাডাম মানুষটাকে বোঝাই না—শিঙ্গাড়া, লাড্ডু, রসগোল্লা, সন্দেশ সবকিছু নিয়ে হচ্ছেন ম্যাডাম।

পরদিন আমি একটু সকাল সকাল স্কুলে গিয়ে তারেকের জন্যে অপেক্ষা করছি। যারা এর মাঝে এসে গেছে তাদের সবাইকে বলে রেখেছি তারেক এলে সবাই যেন তার সাথে ভালোভাবে কথা বলে, তার বাংলা শুনে যেন কেউ হাসাহাসি না করে। কাজল একটু আপত্তি করার চেষ্টা করে বলল, "কেন , সে কোথাকার লাট সাহেব যে তার সাথে ভালো করে কথা বলতে হবে?"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "বিদেশ থেকে এত আশা করে এই দেশে থাকার জন্যে এসেছে—"

কাজল বলল, "সেইজন্যেই তো এই দেশের নিয়মে তারে ধরে প্রথমেই একটা ছেঁচা দেওয়া দরকার।"

কাজলের সাথে তর্ক করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, তাই আমি সেই চেষ্টা না করে মুখ গম্ভীর করে বললাম, "আমি তোকে আমার নিজের কথা বলছি না। মান্নান স্যারের কথা বলছি।"

কাজল চোখ বড় বড় করে বলল, "মান্নান স্যার? তোরা মান্নান স্যারের বাসায় গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।"

কাজল একটু রেগে বলল, "আমাকে নিয়ে গেলি না কেন?"

"বিকালবেলা গিয়েছি, তখন তোকে আমরা কোথায় পাব?"

"ম্যাডাম কী খেতে দিয়েছেন?"

ম্যাডাম কী কী খেতে দিয়েছেন সেটা বলতে হল। আর সেটা শুনে কাজল মনে হল আরো রেগে উঠল। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমরা সেখানে খেতে যাই নি কিন্তু কাজল সেটা বুঝতে রাজি হল না, আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত

হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা ইবু, মান্নান স্যার তোকে ফোড়ার কথা কী বলছিলেন?"

আমি না বোঝার ভান করে বললাম, "ফোড়া? কীসের ফোড়া?"

"ঐ যে কোথায় যেন তোর ফোড়া উঠেছিল—কাটতে হল—"

এবার অনেকে শোনার জন্যে এগিয়ে এল, একজন বলল, "তোর কোথায় ফোড়া উঠেছিল?" আরেকজন বলল, "সত্যি কাটতে হল?" আরেকজন বলল, "ব্যথা করে নি?" অন্যেরা বলল, "দেখা দেখি কোথায় ফোড়া উঠেছিল—"

একেবারে মহাবিপদের মাঝে পড়ে গেলাম। কপাল ভালো ঠিক তখন দেখতে পেলাম তারেক তার ব্যাগ ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "ঐ যে তারেক আসছে। যেটা বলেছি মনে থাকে যেন।"

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মুখ দেখে মনে হল না আমার কথাটা মনে রাখার জন্যে তাদের কারো খুব মাথাব্যথা আছে। তারেক আবার কাসেমের ব্যাগ সরিয়ে তার ব্যাগ রেখে সেখানে বেশ আরাম করে বসল। কাসেম বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ঘ্রোঁত করে শব্দ করল, যার অর্থ হল—দেখলি তুই দেখলি এই ছেলে কী কারবারটা করল?

আমি তারেকের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তারেক, তোমার খবর কী?"

তারেক বলল, "কবর বালো।"

নিশ্চয়ই বলতে চেষ্টা করেছে 'খবর ভালো' এবং সেটা বুঝতে আমাদের কারোই সমস্যা হল না কিন্তু বেআক্কেল কাজল একেবারে সবগুলো দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে শুরু করল। হাসি জিনিসটা মনে হয় চিকেন পক্স কিংবা চোখ ওঠা থেকেও বেশি ছোঁয়াচে। কাজলকে দেখে প্রথমে সাদিব, তারপরে জাহিদ, তারপরে জয়ন্ত এবং সবার শেষে কাসেমও হাসতে শুরু করল।

শুধু আমি অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে মুখ গম্ভীর করে বললাম, "কী হল? তোরা বোকার মতো হাসছিস কেন?"

কাজল আঙুল দিয়ে তারেককে দেখিয়ে বলল, "এই ছেলে বলে কী? কবর বালো? কার কবর? শ্বশুরের কবর?"

তারেক ভুরু কুঁচকে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, "নো-নো—শ্বশুড়েড় কবর না আমার কবর বালো।"

আবার একটা হাসির দমক উঠতে যাচ্ছিল, আমি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললাম, "তোরা চুপ কর দেখি। আমি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।"

কেউ চুপ করার কোনো নিশানা দেখাল না। আমি তার মাঝেই পরিচয় করানো শুরু করলাম। কাজলকে দেখিয়ে বললাম, "এই হচ্ছে কাজল—"

তারেক বলল, "খ্যাজোল?"

'খ্যাজোল' কথাটি শুনে যা একটা ব্যাপার ঘটল সেটা আর বলার মতো নয়। কাজল ছাড়া অন্য সবাই একেবারে পেটে ধরে হাসতে শুরু করল। শুধু হাসি নয়, সবাই মিলে কাজলের পেটে খোঁচা দিয়ে বলতে শুরু করল, "এই খ্যাজোল!" "এই খ্যাজোল!"

শুধু কাজল বোকার মতন মুখ করে বলতে লাগল, "ইয়ারকি মারবি না—ভালো হবে না কিন্তু!"

তারেক বলল, "টুমড়া এটো হাসছ কেন?"

সাদিব বলল, "তুই জোকারি করবি—আর আমরা হাসব না?"

আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। শুধু যে টিটকারি মারছে তাই না—রীতিমতো তুই-তোকারি শুরু করেছে। তারেকের অবশ্য সেটা নিয়ে মাথাব্যথা দেখা গেল না। হাসি হাসি মুখে বলল, "আমি জোকাড়ি কড়ছি না। আমি বালো বাংলা বলটে পাড়ি না।"

ততক্ষণে সবাই মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। একজন আরেকজনকে দেখিয়ে তার নাম বলে, তারেক সেটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করে এবং অন্য সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে। জয়ন্তকে বলল জায়িন্টু, সাদিবকে শেডিব, জাহিদকে জ্যাহিড। সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হল কাসেমের নাম—তাকে বলল খ্যাজিম। সবাই যখন কাসেমকেও খ্যাজিম বলে ডাকতে লাগল তখন কেন জানি কাসেম একেবারেই রেগে উঠল না, দাঁত বের করে হাসতে লাগল। কাসেম কথা বলে কম, হাসে আরো কম, তাই সে যখন হাসে তখন তাকে খুব অদ্ভুত দেখায়।

সবার নাম যখন শেষ হয়েছে তখন কাজল বলল, "এখন তুই তোর নিজের নামটা কী বল!"

তারেক বলল, "ট্যাড়েক।"

আবার একটা হাসির রোল উঠল! এবারে সবাই তারেকের পেটে খোঁচা মেরে বলতে লাগল, "ট্যারা-ট্যাড়েক ট্যারা-ট্যাড়েক—"

ব্যাপারটা একেবারে সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ছেলেটার সাথে ভালো ব্যবহার করে তার সাথে একটা বন্ধুত্ব করার কথা, উল্টো সবাই মিলে তাকে টিটকারি মারা শুরু করেছে! আমি তার আম্মুকে বলেছি সবাই মিলে তাকে দেখেশুনে রাখব। এক সপ্তাহ সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু এক সপ্তাহ কোথায় এক ঘণ্টার মাঝে মনে হয় ছেলেটাকে এখান থেকে ভাগিয়ে দেবে। কিছু একটা করার জন্যে আমি এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে কিছু একটা বলতে গেলাম, তখন অবাক হয়ে দেখি তারেক নিজেই দাঁত বের করে হাসছে। তাকে ট্যারা-ট্যাড়েক বলে পেটে খোঁচা মারা ব্যাপারটি যেন খুব আনন্দের ব্যাপার এবং পুরো ব্যাপারটায় তার স্ফূর্তির কোনো শেষ নেই। এই প্রথমবার আমিও ব্যাপারটার মজার অংশটা দেখতে পেলাম এবং অন্য সবার সাথে হাসিতে যোগ দিলাম। হাসি ব্যাপারটা খুব মজার একটা জিনিস—এক শ রকমের ঝামেলা একটা হাসি দিয়ে দূর করে দেওয়া যায়। এখানেও মনে হয় সেই রকম একটা ব্যাপার হল—হাসাহাসি ব্যাপারটা দিয়েই তারেক প্রায় হঠাৎ করেই আমাদের নিজেদের একজন হয়ে গেল। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, কাসেম পর্যন্ত তার জায়গাটা তারেককে ছেড়ে দিল।

বিকালবেলা স্কুল ছুটির পর সবাই বের হয়েছি, বাইরে একটা গাড়িতে তারেকের আম্মু উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছেন। আমাদের দেখে দরজা খুলে বের হয়ে এলেন। তারেককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল তারেক? আজকে কী অবস্থা?"

তারেক ইংরেজিতে কিছু একটা বলল, সাথে সাথে তারেকের আম্মুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "বলেছিলাম না তোকে? আমি বলেছিলাম না—"

তারেক তখন আরেকটা কী বলল, মনে হয় স্কুলটাকে গালি দিয়ে, তখন তার আম্মু বললেন, "এইখানে কি আর তোর আমেরিকার মতো স্কুল পাবি? তা ছাড়া পড়াশোনাটা নিজের ওপর—স্কুলে যাবি আসবি। বন্ধুদের সাথে সময় কাটাবি। পড়াশোনা করবি বাসায়।"

তারেক আবার ঝড়ের বেগে ইংরেজিতে কী যেন বলতে থাকে—আস্তে বললে বোঝার একটা সুযোগ ছিল কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বললে কিছু বোঝার উপায় নেই। তার আম্মু মাথা নাড়তে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। কথা শেষ হবার পর তারেকের আম্মু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের বাসা কোথায়? এস তোমাদের নামিয়ে দিই।"

আমি বললাম, "না খালাম্মা লাগবে না। আমরা নিজেরাই চলে যেতে পারব।"

কাজল বলল, "আমরা অনেকজন—আপনার গাড়িতে আঁটবে না!"

খালাম্মা বললেন, "গাদাগাদি করে বসে যাব।"

এত সুন্দর একটা গাড়িতে গাদাগাদি করে বসে যাওয়া ব্যাপারটা হয়তো খারাপ হত না—আমি প্রায় রাজি হয়েই যাচ্ছিলাম। তখন হঠাৎ তারেক তার আম্মুকে ইংরেজিতে বলল, "তুমি চলে যাও আম্মু। আমি এদের সাথে হেঁটে হেঁটে যাই।"

"হেঁটে হেঁটে যাবি?"

"হ্যাঁ।"

খালাম্মা কিছু একটা ভাবলেন, তারপরে বললেন, "ঠিক আছে।"

আমি বললাম, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না খালাম্মা—আমরা বাসায় পৌঁছে দেব।"

"সাবধানে এস সবাই।"

কাজল বলল, "আমরা সাবধানেই যাই—তা না হলে কবে সবাই মরে ভূত হয়ে যেতাম। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা—"

কাজলের কথা শুনে খালাম্মা সাহস পাবার বদলে মনে হয় আরেকটু নার্ভাস হয়ে গেলেন। কাজলটা একটু গাধা টাইপের। কখন কার সাথে কী নিয়ে কথা বলতে হয় সেই ব্যাপারটাই জানে না।

"সেদিন হয়েছে কী—" কাজল কোনো একটা ভয়ঙ্কর জিনিস নিয়ে কথা শুরু করে দিতে চাইছিল, আমি ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিলাম।

তারেকের বাসার ঠিকানা নিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে রওনা দিলাম। প্রথম তিন দিন তারেক একবারও তার মুখটা খোলে নি—এখন ঠিক তার উল্টো। একেবারে একটানা কথা বলে যেতে লাগল—উচ্চারণ খুবই অদ্ভুত কিন্তু সেটা নিয়ে তার কোনো সঙ্কোচ নেই। আমার মনে হয় আমাদের সাথে কথা বলে বলে সে তার বাংলাটা প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে। চালু ছেলে, বুঝে গিয়েছে খামাখা লজ্জা করে মুখ বন্ধ রেখে কোনো লাভ নেই। বাংলাটা যখন শিখতেই হবে তখন আমাদের সাথে যত বেশি কথা বলবে তত তাড়াতাড়ি কথা বলতে শিখবে।

তারেকের বাসা স্কুল থেকে খুব বেশি দূরে না, আমাদের আধঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা না। কিন্তু আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল—কারণ আমরা গেলাম খুব আস্তে আস্তে। রাস্তাঘাটে যেটাই দেখে সেটাতেই তারেকের কৌতূহল! কোন ফিরিওয়ালা কী বিক্রি করছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, রাস্তার প্রত্যেকটা ভিক্ষুককে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল, প্রত্যেকটা টেম্পোর হেল্পারকে নিয়ে গবেষণা করল। কোনটা কী সেটা জানতে চাইল, কোন বাস কোথায় যায়, কোন টেম্পোর কী রুট, কোনটার কত ভাড়া কিছুই বাকি থাকল না। আমরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি কিন্তু তারেকের চোখে সবই নূতন। ব্যাপারগুলো তার চোখে ভালো না খারাপ লাগছে আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু তার কাছে যে অন্যরকম লাগছে সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি।

তারেকের বাসায় পৌঁছে দেখি তারেকের আম্মু উদ্বিগ্ন মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে মনে হয় তার জানে পানি ফিরে এল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এত দেরি হল কেন বাবারা? আমি তো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "হেঁটে হেঁটে এসেছি তো, রাস্তায় এত ইন্টারেস্টিং জিনিস সবকিছু দেখে দেখে আসতে দেরি হয়ে গেছে।"

তারেক ইংরেজিতে কিছু একটা বলল, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে তাই ধরতে পারি না। মনে হয় টেম্পোর হেলপারদের নিয়ে কিছু একটা বলেছে। তারেকের আম্মু গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কী করবি বল, গরিব দেশ ছোট থাকতেই ফেমিলিকে হেল্প করতে হয়।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও তোমরা চট করে হাত-মুখ ধুয়ে এস, তোমাদের জন্যে টেবিলে নাশতা রেখেছি।"

কাজলকে এবারে খুব উৎসাহী দেখা গেল, বলল, "কোনদিকে বাথরুম?"

কাজলকে যেরকম উৎসাহ নিয়ে বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে যেতে দেখলাম সেরকম আগে কখনো দেখি নি। এমনিতে সে আমাদের মাঝে খবিশ টাইপের, হাত-মুখ ধোয়া দূরে থাকুক শীতকালে গোসল করে কি না সেটা নিয়েই আমার সন্দেহ আছে।

নাশতার টেবিলে অনেক রকম খাবার, কোনটা ছেড়ে কোনটা খাব সেটা নিয়েই চিন্তায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, আরো দেরি হলে বাসায় দুশ্চিন্তা শুরু করে দেবে তাই আমরা তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে দৌড়ালাম। বাসার লোকজন দুশ্চিন্তা করলে আমাদের খুব মাথাব্যথা হয় না কিন্তু তার ফলে যদি অল্পবিস্তর পিটুনি খেতে হয় সেটা নিয়েই ভয়।

যখন একটা সহজ-সরল অ্যাডভেঞ্চার আর সহজ-সরল না থেকে এমন জটিল হয়ে গেল যে আমাদের প্রায় বারোটা বেজে যাবার অবস্থা!

তারেক তার আম্মুকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিল—আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম এই সময়ের মাঝে তারেককে আমরা নরম করিয়ে ফেলব এবং ব্যাপারটা প্রায় সেদিকেই এগুচ্ছিল। কিন্তু তার মাঝে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটল। সেটা ছোটখাটো কোনো অঘটন নয়,

বিশাল বড় অঘটন—বলা যেতে পারে সেই অঘটনে আমাদের জীবনটাই প্রায় উল্টাপাল্টা হয়ে যাবার অবস্থা।

সেদিন ছিল বুধবার। স্যারদের কী একটা মিটিং তাই স্কুল ছুটি হয়ে গেল আগে। অন্যদিনের মতো সবাই হেঁটে হেঁটে বাসায় যাচ্ছি আর তারেকও অন্যদিনের মতো সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ফুটপাতে লালসালু দিয়ে একটু জায়গা ঘেরাও করে সেখানে একজন পাহাড়ি হালুয়া বিক্রি করছে। অসভ্য অসভ্য সব অসুখের নাম করে সে বলছে সব রোগ এই পাহাড়ি হালুয়া খেলে ভালো হয়ে যাবে। তারেক খুব মনোযোগ দিয়ে লোকটার বক্তৃতা শুনে কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। আমরা তখন তাকে টেনে সরিয়ে আনলাম। রাস্তার পাশে টিয়াপাখি দিয়ে একজন ভবিষ্যৎ গণনা করে, সেটা মাত্র দেখা শুরু করেছি, ঠিক হঠাৎ কী একটা দেখে তারেক চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাল, বলল, "ও মাই গুডনেস!"

এমনিতে তারেক আমাদের সাথে সব সময় বাংলা বলে, সত্যি কথা বলতে কি, এই কয়দিন আমাদের সাথে একটানা বাংলা বলে বলে তার বাংলাটা মোটামুটিভাবে ঠিক হয়ে গেছে—'র' কে 'ড়' আর 'ত' কে 'ট' বলা ছাড়া উচ্চারণেও খুব বেশি ঝামেলা নেই। কিন্তু হঠাৎ করে কিছু বলতে গেলে কিংবা রেগে গেলে ইংরেজি চলে আসে। তাই এখন তার ইংরেজি শুনে আমরা অবাক হয়ে তারেকের মুখের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"কিডন্যাপ।"

"কিডন্যাপ?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী কিডন্যাপ?"

"একটা মেয়েকে। এ লিটল গার্ল।"

"একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে? কে কিডন্যাপ করেছে?"

"ইনসাইড দ্যাট স্কুটার।"

উত্তেজনায় তারেক কথা বলতে পারছিল না। উত্তেজিত হলে সে বাংলায় কথা বলতে পারে না—সেটা আরেকটা সমস্যা। কোনোভাবে চেষ্টা করে সে যেটা বলল, সেখান থেকে বুঝতে পারলাম যে, সে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক তখন দেখতে পেয়েছে একটা স্কুটার যাচ্ছে, সেই স্কুটারে একটা ছোট মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে আর একজন মানুষ তার মাথায় একটা রিভলবার ধরে রেখেছে।

আমরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তারেকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "রিভলবার?"

"ইয়েস।"

"সত্যি দেখেছিস?"

তারেক মাথা নেড়ে অধৈর্য গলায় বলল, "আমি কি টোডের সাঠে মিঠ্যা কঠা বলব?"

সেটা সত্যি। দুপুরবেলা একটা বড় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে খামাখা তারেক আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলবে কেন? তারেক দূরে স্কুটারটির দিকে তাকিয়ে রইল, ট্রাফিক লাইটে এখন দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারেকের চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল। হাত মুঠি করে ইংরেজিতে বলল, "মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে।"

"কীভাবে?"

"আই ডোন্ট নো—"

ঠিক তখন সামনে একটা খালি স্কুটার এসে থামল। আমরা কিছু না ভেবেই প্রায় একসাথে স্কুটারটার দিকে ছুটে গিয়ে স্কুটারওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, "যাবেন?"

স্কুটারওয়ালা বলল, "কোথায়?"

আমরা তার উত্তর না দিয়ে হুড়মুড় করে সবাই ভিতরে ঢুকে বললাম, "ঐ যে সামনে।"

স্কুটারওয়ালা একটু অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে স্কুটার ছেড়ে দিল। তারেক বলল, "জোড়ে। অনেক জোড়ে।"

স্কুটারওয়ালারা এমনিতেই খুব জোরে স্কুটার চালায় তাই কেউ যদি তাকে জোরে চালাতে বলে সেটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। হয়েও গেল তাই। স্কুটারটা প্রায় উড়ে যেতে শুরু করল। যদি এর দুইপাশে দুইটা পাখা লাগিয়ে দেওয়া যেত তা হলে সত্যি সত্যি আকাশে উড়ে যেত সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

দেখতে দেখতে আমরা সামনের স্কুটারের কাছাকাছি চলে এলাম। ভেতরে কে আছে এখনো দেখা যাচ্ছে না। আমাদের স্কুটারটা যখন সেটাকে পার হয়ে গেল তখন আমরা সবাই একসাথে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, সত্যি সত্যি সেখানে ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা একটা মেয়ে এবং তাকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছে নিষ্ঠুর চেহারার একজন মানুষ। একটি চলন্ত স্কুটার থেকে আরেকটি চলন্ত স্কুটারের ভেতরে দেখা খুব সোজা নয় কিন্তু তার মাঝেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটা ভয়ে আতঙ্কে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে বসে থাকা বাচ্চা মেয়েটার মাথায় একটা রিভলবার ধরে রেখেছে। আমি শুকনো গলায় বললাম, "সর্বনাশ!"

আমাদের স্কুটারটা তখন পার হয়ে চলে যেতে শুরু করেছে, আমরা স্কুটারওয়ালাকে বললাম, "একটু আস্তে।"

স্কুটারওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, "একবার বল জোরে একবার বল আস্তে, কোনটা করব? আগে নিজেদের মন ঠিক কর।"

জয়ন্ত বলল, "আরেকটা স্কুটারের সাথে যাচ্ছি তো তাই একসাথে যেতে চাই।"

"সেইটা আগে বলবে তো। কোন স্কুটার?"

"আপনার পিছনে যেটা যাচ্ছে। এইটার পিছনে পিছনে যান।"

স্কুটারওয়ালারা সাধারণত কারো কথা শোনে না, কিন্তু এই স্কুটারওয়ালা আমাদের কথা শুনল। কিডন্যাপ করা মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেই স্কুটারে সেইটার পিছনে পিছনে যেতে শুরু করল। প্রথম সমস্যাটা সমাধান করা গেছে—এখন অন্য সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেওয়া যায়। প্রথম সমস্যা হচ্ছে স্কুটার ভাড়া—মিটারে চড় চড় করে ভাড়া উঠে যাচ্ছে, আমাদের কাছে সেই ভাড়ার টাকা আছে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমি গলা নামিয়ে বললাম, "কার কাছে কত আছে?"

আমাদের কারো কাছেই আসলে বেশি টাকাপয়সা থাকে না। তারপরেও দেখি বিরানব্বই টাকা হয়ে গেল। তার মাঝে অবিশ্যি অর্ধেকের বেশি তারেকের। আমি, জয়ন্ত, কাজল আর কাসেম মিলে বাকি অর্ধেক। স্কুটার ভাড়া যেভাবে উঠছে আমরা মনে হয় আরো

আধা ঘণ্টা যেতে পারব, কিন্তু তারপরে কী করব? এখন অবিশ্যি চিন্তা করার সুযোগ বেশি নেই—ঘটনা যেভাবে অগ্রসর হবে সেইভাবে কাজ করতে হবে।

কাজল ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "পুলিশকে বলতে হবে।"

"পুলিশ? পুলিশ আমাদের কথা শুনবে?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "না।"

কাসেম নাক দিয়ে ঘ্রোঁত করে একটা শব্দ করল।

আমি তখন বললাম, "স্কুটারটা যদি কোথাও থামে তা হলে কাসেম গিয়ে মানুষটাকে ধরে ফেলতে পারে।" আমি কাসেমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাসেম, পারবি না?"

কাসেম আবার ঘ্রোঁত করে শব্দ করল, যার অর্থ হতে পারে 'হ্যাঁ', 'না', 'অবশ্যই' কিংবা 'কক্ষণো না'। সে কোনটা বুঝিয়েছে বুঝতে পারলাম না, কখনোই অবিশ্যি ঠিক করে বুঝতে পারি না।

স্কুটারটা এয়ারপোর্ট পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ রাস্তায় ঘুরে গেল—আমরা চিৎকার করে স্কুটারওয়ালাকে বললাম, "ঘোরান—ঘোরান—স্কুটার ঘোরান।"

স্কুটারওয়ালা গজগজ করে বলল, "স্টেশনে যাবে—আগে বললেই পারতে।"

আমরা স্টেশনে যেতে চাইছি সেটা সে কেমন করে আন্দাজ করল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সত্যি সত্যিই কিডন্যাপ করা মেয়েটাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষের স্কুটারটা এয়ারপোর্ট স্টেশনে ঢুকে গেল, আমরাও পিছু পিছু এসে ঢুকলাম। আমরা যখন তাড়াহুড়া করে স্কুটারের ভাড়া দিয়ে নেমেছি ততক্ষণে কিডন্যাপারটা ছোট মেয়েটার হাত ধরে প্রায় ছুটে স্টেশনের দিকে যেতে শুরু করেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে আমাদের নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আমরা পাঁচ জনও প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে স্টেশনে ঢুকে গেলাম। একটু আগেই কিডন্যাপার মানুষটা এসেছে কিন্তু এখন তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে বাতাসের মতো উবে গেছে। স্টেশনের প্লাটফর্মে অনেক মানুষের ভিড় তার মাঝে আমরা কিডন্যাপারকে খুঁজতে থাকি। হঠাৎ করে জয়ন্ত বলল, "ঐ যে—"

আমরা তাকিয়ে দেখি মানুষটা এক হাতে মেয়েটাকে ধরে রেখেছে, অন্য হাত পকেটে। নিশ্চয়ই সেই হাতে রিভলবার। এত ভিড়ের মাঝে মেয়েটা যদি ঝটকা মেরে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে ছুটে যেত তা হলে মানুষটা কিছু করতে পারত না। কিন্তু মেয়েটার ভীত আতঙ্কিত রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটার সেই সাহস নেই। সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

আমরা চোখের কোনা দিয়ে মেয়েটা এবং কিডন্যাপারটাকে চোখে চোখে রেখে কাছাকাছি এগিয়ে এলাম। কাজল ফিসফিস করে বলল, "এখন কী করব?"

আমি কাসেমের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কাসেম, তুই মানুষটাকে পিছন থেকে ধরে ফেলতে পারবি না?"

কাসেম নাক দিয়ে ঘ্রোঁত করে শব্দ করল, সাথে সাথে মাথাটাও নাড়ল বলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সে পারবে। আমি বললাম, "গুড।"

জয়ন্ত বলল, "তারেক, তুমি তখন মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসো। পারবে না?"

তারেক বলল, "অফ কোর্স।"

কাজল বলল, "আমরা? আমরা কী করব?"

আমি বললাম, "আমরা কাসেমের সাথে সাথে থাকব, কাসেমকে সাহায্য করব। ঠিক আছে?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে। এমন ঘুসি দেব শালাকে—"

জয়ন্ত কবি মানুষ ঘুসির কথা শুনে ঘাবড়ে গেল, বলল, "ঘুসি? ঘুসি দিতে হবে?"

"দরকার হলে কিল-ঘুসি সবই দিতে হবে।"

জয়ন্ত তখন ইতস্তত করে বলল, "আমি তা হলে তারেকের সাথে থাকি। আমি আর তারেক মেয়েটাকে নিয়ে ছুটে যেতে থাকব। ঠিক আছে?"

কে মেয়েটাকে নিয়ে ছুটে যাবে আর কে কিডন্যাপারকে ধরবে সেটা নিয়ে একটা তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যাবার অবস্থা হল, ঠিক তখন আমরা দেখলাম গর্জন করতে করতে একটা ট্রেন হাজির হয়েছে। প্লাটফর্মে হঠাৎ করে মানুষের ভিড় হইচই প্রায় এক শ গুণ বেড়ে গেল। আমি বললাম, "দেরি করা যাবে না। কুইক।"

আমরা তখন কিডন্যাপারকে ধরার জন্যে ছুটে যেতে থাকি। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করছে। মনে হচ্ছে এত জোরে শব্দ হচ্ছে যে আশপাশে যারা আছে তারা সবাইও বুঝি সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

আমরা মোটামুটিভাবে তিনদিক থেকে কিডন্যাপারটাকে ঘিরে ফেলেছি। ঠিক যখন কাসেম কিডন্যাপারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন কিডন্যাপার ব্যাপারটি মনে হয় বুঝে ফেলল। সে হঠাৎ মেয়েটার হাত ধরে ছুটতে থাকে এবং স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের একটা কম্পার্টমেন্টে লাফিয়ে উঠে যায়। আমরা হতভম্ব হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, কী করব বুঝতে পারলাম না। কাজল উত্তেজিত গলায় বলল, "এখন? এখন কী করব?"

জয়ন্ত বলল, "চিৎকার করব?"

তারেক ভুরু কুঁচকে বলল, "চিটকার? চিটকার কেন?"

"তা হলে?"

আমরা ঠিক তখন ট্রেনের হুইসেল শুনলাম এবং বুঝতে পারলাম কিডন্যাপার আর ভীত-আতঙ্কিত মেয়েটিকে নিয়ে ট্রেনটি ছেড়ে দিচ্ছে। এটি কী ট্রেন, কোথায় যাচ্ছে কিছুই আমরা জানি না। আর কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ট্রেনটা ছেড়ে দেবে, তারপর আর কখনোই মেয়েটাকে উদ্ধার করা যাবে না। আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম—এখন আমরা কী করব?

আমি একমুহূর্ত চিন্তা করলাম, এখন এই ট্রেনে উঠে পড়াটা নিঃসন্দেহে একটা দুঃসাহসিক কাজ হয়ে যাবে। আমাদের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন কেউই ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করবে না। কিন্তু যখন মেয়েটাকে উদ্ধার করা হবে—সবাই যখন জানতে পারবে একটা কিডন্যাপারের হাত থেকে একটা ছোট মেয়েকে আমরা উদ্ধার করে এনেছি তখন তারা হয়তো কিছু বলতে পারবে না। চিন্তা করার খুব বেশি সময় নেই,

যেটা করতে চাই সেটা এক্ষুণি ঠিক করতে হবে। আমি সবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "ট্রেনে উঠে যাই।"

তারেক ভয়ে ভয়ে বলল, "টিকিট?"

আমি বললাম, "সেটা পরে দেখা যাবে।"

জয়ন্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ততক্ষণে ট্রেনটা নড়তে শুরু করেছে। এখন আর দেরি করার সময় নেই। আমরা দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। দেখতে দেখতে ট্রেনটার গতি বেড়ে যেতে থাকে, প্লাটফর্মটা অদৃশ্য হয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই ট্রেনের জানালা দিয়ে শহর রাস্তাঘাট পেছনে সরে যেতে থাকে। কাজল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করল, "এই ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে?"

মানুষটা চোখ-মুখ পাকিয়ে বলল, "ট্রেন কোথায় যাচ্ছে না জেনে ট্রেনে উঠে পড়েছ?" মানুষটা এবারে আমাদের সবার দিকে তাকাল, তারপর চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বলল, "তোমরা কার সাথে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ?"

বোঝাই যাচ্ছে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলে ঝামেলা শুধু বাড়তেই থাকবে। তাই আমরা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আরো ভিতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি এক ধরনের সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। কাজল নিচুগলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে?"

"কী আর হবে!" আমি সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে বললাম, "প্রথমে কিডন্যাপারটা আর মেয়েটাকে খুঁজে বের করি।"

অন্যেরাও মাথা নাড়ল। পাঁচ জন তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে স্কুলের পোশাক পরে পিঠে ব্যাকপেকে বইপত্র নিয়ে যদি ট্রেনে উঠে যায় তখন ট্রেনের যাত্রীরা ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখতেই পারে। কিন্তু যখন তারা আবিষ্কার করবে একটা কিডন্যাপারের হাত থেকে বাচ্চা একটা মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে এই ছেলেগুলো ট্রেনে উঠেছে তখন নিশ্চয়ই তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। কাজেই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে কিডন্যাপারটা খুঁজে বের করা। আমরা তাই ট্রেনের ভেতরে হাঁটতে শুরু করলাম।

কিডন্যাপারটা মেয়েটাকে নিয়ে সামনের কোনো একটা বগিতে উঠেছে, কাজেই আমরা সামনের দিকে হাঁটতে থাকি। ট্রেনটা মাত্র ছেড়েছে বলে মানুষজন এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়ে বসে নি—নিজেদের মালপত্র গুছিয়ে রাখছে—একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে, হাঁটাহাঁটি করছে। আমরা তার মাঝে দিয়ে সামনের দিকে হাঁটছি। এক বয়সের পাঁচ জন ছেলে স্কুলের পোশাকে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে—সবাই একটু অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। আমরা যতটুকু সম্ভব চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছি, কারণ দৃষ্টিটায় যেটুকু অবাক তার থেকে অনেক বেশি সন্দেহ।

দুই বগি সামনে গিয়ে আবিষ্কার করলাম একজন টিকিট চেকার টিকিট চেক করছে। আমাদের কাছে টিকিট নেই তাই আমাদের আর সামনে যেতে সাহস হল না। আমরা আবার পিছিয়ে এলাম। ট্রেনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আরো একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। আমরা নিচুগলায় কথা বলছি, এখন কী করা যায় সেটা নিয়েই ভাবনা। যত সময় চলে যেতে থাকবে ট্রেনটা তত দূরে চলে

যাবে—পুরো ব্যাপারটা তখন আরো কঠিন হয়ে যাবে। না ভেবে হুট করে ট্রেনে উঠে পড়েছি, এখন মনে হচ্ছে কাজটা মনে হয় ঠিক হল না—স্টেশনে কোনো একজন পুলিশকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেই হত। কাজল এর মাঝে মুখ ভোঁতা করে গজগজ করতে শুরু করেছে, কয়েকবার বলে ফেলেছে, "তোদের সাথে আমার আসাই ঠিক হয় নি। যত্তোসব পাগলামি।" আমি চাপা গলায় সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া মানুষটা বলল, "কী ব্যাপার, তোমাদের কোনো প্রবলেম?"

সবাই একসাথে মাথা নেড়ে বললাম, "না-না-না—কোনো প্রবলেম নাই।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "না, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে সমস্যা হয়েছে।"

জয়ন্ত বলল, "ইয়ে মানে এই ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে জানেন?"

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, "চিটাগাং।" তারপর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোথায় যাবে?"

জয়ন্ত আমতা-আমতা করে বলল, "না—মানে—ইয়ে—"

আমি বুঝতে পারলাম এখন আর আমতা-আমতা করার সময় নেই, কিছু একটা বলে ফেলতে হবে। তাই কোনো কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললাম, "জি। আমরা চিটাগাংই যাব।"

ভদ্রলোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে তো ঠিক ট্রেনেই উঠেছ।"

আমরা মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, "তোমরা কি একা একা যাচ্ছ, নাকি সাথে বড় কোনো মানুষ আছে?"

আমি আগেও দেখেছি মিথ্যা কথা বলার এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটা মিথ্যা কথা বললে সেটাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আরো দশটা মিথ্যা কথা বলতে হয়। সেই দশটাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে প্রত্যেকটার জন্যে দশটা করে আরো একশ'টা। এতগুলো মিথ্যা কথা টানা বের করে যাওয়া সোজা ব্যাপার না—কিন্তু মনে হচ্ছে এখন আর কোনো উপায় নেই। আমি শুরু করে দিলাম, দ্বিতীয় মিথ্যা কথাটি বললাম, "আসলে একজন বড় মানুষ আছেন আমাদের সাথে।"

"ভেরি গুড।" ভদ্রলোক সুন্দর করে হাসলেন। বললেন, "কোথায়?"

আমাকে তিন নম্বর মিথ্যা কথা বলতে হবে কিন্তু তার মাঝে আমি মাথা খাটাতে শুরু করলাম—কোনোভাবে কি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল—ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখি কিংবা কে জানে হয়তো আধা ডজন পাখি মেরে ফেলা যাবে। আমি বললাম, "আসলে সেটাই হয়েছে সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

চার নম্বর মিথ্যা কথা, "আমাদের সাথে যাওয়ার কথা আমার ছোট মামার।"

"ও আচ্ছা।"

"ছোট মামার সাথে এই স্টেশনে এসে দেখা করার কথা। (পাঁচ নম্বর মিথ্যা কথা।) স্টেশনে এসে মামাকে খুঁজে পাই না। (ছয় নম্বর মিথ্যা কথা।) তার মাঝে ট্রেনটা এসে গেল—কী করব বুঝতে না পেরে ট্রেনে উঠে গেছি। (সাত নম্বর মিথ্যা কথা।)"

ভদ্রলোকের চেহারায় একটু দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। তিনি বললেন, "তা হলে তুমি বলছ তোমার মামা এই ট্রেনে উঠেছেন কি না তুমি জান না?"

"উঁহুঁ।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমরা জানি না।" (আট নম্বর মিথ্যা কথা।)

এবারে মিথ্যা কথা বলায় জয়ন্তও যোগ দিল। বলল, "তাই আমরা ভাবছিলাম ট্রেনটাতে একটু খুঁজে দেখি।" (নয় নম্বর মিথ্যা কথা।)

কাজলও পিছিয়ে থাকল না, বলল, "কোন বগিতে সিট পড়েছে সেইটাও জানি না।" (দশ নম্বর মিথ্যা কথা।)

ভদ্রলোক বললেন, "তোমার মামার মোবাইল টেলিফোন আছে?"

আজকাল সবার মোবাইল টেলিফোন থাকে, তাই আমাকে বলতে হল, "আছে।" (এগার নম্বর মিথ্যা কথা।)

ভদ্রলোক তার পকেট থেকে ছোট একটা মোবাইল টেলিফোন বের করে বললেন, "নম্বর কত?"

আমরা একটু বিপদে পড়ে গেলাম, আমতা-আমতা করে বললাম, "ইয়ে—মানে—হয়েছে কি—নাম্বারটা তো জানি না।" এই কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না, আমার ছোট মামা বলে কেউ নাই, তার মোবাইল টেলিফোনও নাই—সেটা আসলেই আমি জানি না। আমার অন্য সব মিথ্যা কথাকে শুনিয়েছে সত্যি কথার মতো কিন্তু এই সত্যি কথাটাকে শোনাল একেবারে মিথ্যা কথার মতো। তাই জয়ন্ত আবার আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করল, বলল, "আমি এত করে বললাম নম্বরটা কাগজে লিখে রাখ, তুই লিখলি না।" (বারো নম্বর মিথ্যা কথা, দেখতে দেখতে ডজন পুরা হয়ে গেল।)

ভদ্রলোক বললেন, "তা হলে তো আর কিছু করার নেই, তোমাদের প্রত্যেকটা বগিতে গিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখতে হবে।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জি।" তারপর সবাইকে বললাম, "আয় আমার সাথে। আমরা খোঁজা শুরু করি।"

সবাই তখন আমার সাথে হাঁটতে শুরু করল। কাজল ফিসফিস করে বলল, "বড় হলে তুই নির্ঘাত মন্ত্রী হবি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"তোর মতো মিথ্যা কথা আর কেউ বলতে পারে না। চোখের পাতি না ফেলে তুই মিথ্যা বলিস।"

কথাটা আমার প্রশংসা হল না নিন্দা হল বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই নিন্দা হবে, কাজল প্রশংসা করে কোনোদিন কাউকে কিছু বলেছে বলে মনে হয় না!

আমরা একটা একটা বগি করে হাঁটতে শুরু করলাম কিন্তু কোথাও কিডন্যাপার আর মেয়েটাকে খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ট্রেনের শেষ মাথায় চলে এসেছি, এখানে ফার্স্ট ক্লাসের বগিগুলো শুরু হয়েছে। ছোট ছোট খোপের মতো কেবিনে দু-তিন জন করে মানুষ। যেসব কেবিনের দরজা খোলা, তার ভেতরের প্যাসেঞ্জারদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু যারা কেবিনের দরজা বন্ধ করে রেখেছে তাদের দেখা যাচ্ছে না। আমরা সামনে দিয়ে কয়েকবার ঘুরে এলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না।

করিডরে দাঁড়িয়ে আমরা ফিসফিস করে কথা বলতে থাকি। জয়ন্ত বলল, "দরজায় টোকা দিলে কেমন হয়?"

কাজল মাথা নেড়ে বলল, "চিনে ফেললে গুলি করে দেবে।"

আমি বললাম, "গুলি করা এত সোজা নাকি?"

কাসেম ঘ্রোঁত করে একটা শব্দ করল, শব্দটা আমার কথার পক্ষে না বিপক্ষে আমি সেটা বুঝতে পারলাম না। তারেক কী একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বাংলায় বলবে না ইংরেজিতে বলবে সেটা ঠিক করতে পারল না তাই কয়েকবার চেষ্টা করে থেমে গেল। ঠিক তখন একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। আমরা সরু করিডরে যে কেবিনটার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছি সেই কেবিনের দরজাটা খুলে গেল এবং ভেতরে তাকিয়ে আমাদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল—দরজার সামনে কিডন্যাপার দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে কিডন্যাপারের ভুরু কুঁচকে গেল। আমরা তখন তাড়াতাড়ি করিডরের সামনে থেকে একটু দূরে সরে গেলাম।

কিডন্যাপারটা কেবিন থেকে বের হল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে আবার আমাদের দিকে তাকাল। আমরা তাড়াতাড়ি তার চোখের দৃষ্টি থেকে আমাদের চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। কিডন্যাপারটা তখন হেঁটে হেঁটে অন্যপাশে গেল, মনে হয় বাথরুমে যাবে।

আমি চাপা গলায় বললাম, "এই আমাদের সুযোগ।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "কাসেম তুই বাইরে থাকিস। কিডন্যাপারটা হঠাৎ ফিরে এলে তুই সামলাবি। পারবি না?"

কাসেম মুখ শক্ত করে ঘ্রোঁত করে একটা শব্দ করল, আমি ধরে নিলাম সে পারবে।

"দেরি করে কাজ নেই, আয়।"

জয়ন্ত বলল, "মেয়েটাকে ড্রাগ দিয়ে রাখে নাই তো?"

"রাখলে রেখেছে" বলে আমি কেবিনটার সামনে গিয়ে টান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ভেতরে মেয়েটা জানালায় মুখ রেখে বাইরে তাকিয়ে আছে। আমাদের ভিতরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকাল, তার মুখে এক ধরনের আতঙ্ক। আমি ফিসফিস করে বললাম, "তোমার কোনো ভয় নেই।"

জয়ন্ত বলল, "আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

কাজল বলল, "কিডন্যাপার তোমাকে আর কিছু করতে পারবে না।"

কিডন্যাপার নিশ্চয়ই মেয়েটিকে এমন ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে তাকে উদ্ধার করতে এসেছি শোনার পরেও মেয়েটার চোখে-মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল না। আমার মনে হল বরং সেখানে আরো ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তারেক এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত ধরে বলল, "চল আমাডের সাঠে।"

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চা মেয়ে, কিডন্যাপার ভয় দেখিয়ে তাকে নিশ্চয়ই একেবারে জবুথবু করে ফেলেছে। তারেক হাত ধরে টান দেবার পরও সে উঠল না। আমরা সবাই তখন তার হাত ধরে টেনে তাকে কেবিন থেকে বের করে নিয়ে এলাম। বাইরে কাসেম দাঁড়িয়ে ছিল, সেও আমাদের সাথে যোগ দিল।

আমরা কয়েক পা গিয়েছি ঠিক তখন দেখতে পেলাম করিডরের অন্যপাশ থেকে দরজা খুলে কিডন্যাপার এগিয়ে আসছে। তার একটা হাত পকেটে, নিশ্চয়ই এখন রিভলবারটা বের করে সে গুলি করে বসবে।

ঠিক তখন যে ব্যাপারটা ঘটল আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটা হঠাৎ নাকি সুরে বলল, "বাবা, এই ছেলেগুলো আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।" তারপর এ্যাঁ এ্যাঁ করে বিচিত্র একটা সুরে কাঁদতে আরম্ভ করল।

যে মানুষটাকে আমরা কিডন্যাপার ভেবেছি সে আসলে মেয়েটার বাবা। আমাদের মাথায় তখন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল। পুরো ব্যাপারটা তখনো আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "বাবা? তোমার বাবা?"

মেয়েটা এ্যাঁ এ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবা, এরা সন্ত্রাসী, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়।"

কিডন্যাপার মানুষটি—যে আসলে কিডন্যাপার নয়, আসলে মেয়েটার বাবা, এবারে ছুটে এসে মেয়েটাকে থাবা দিয়ে ধরল, তার অবিশ্যি দরকার ছিল না কারণ আমরা ততক্ষণে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছি। করিডর থেকে বের হওয়ার আগের মুহূর্তে শেষবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বাবা তার মেয়েকে ধরে ফেলেছে, থাবা দিয়ে ধরতে গিয়ে মেয়েটার একটা বেণী ধরেছে, বেণীটাকে হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় একটা ধাতব নল, যেটাকে আমরা রিভলবার ভেবে ভুল করেছি।

তখন অবিশ্যি এত কিছু ভাবার সময় নেই। আমরা ট্রেনের একটা বগি পার হয়ে অন্য বগিতে ছুটে যাচ্ছি, সেখান থেকে অন্য বগি। পিছনে হইচইয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষজন নিশ্চয়ই আমাদেরকে ধরার জন্যে ছুটে আসছে। ট্রেনের শেষে যখন পৌঁছে যাব তখন আর ছুটে যাবার জায়গা থাকবে না। আমাদের ধরে তখন কী করবে সেটা চিন্তা করে আমার মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠতে থাকে। যদি ছুটে পালিয়ে না আসতাম তা হলে হয়তো মেয়ের বাবাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যেত কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। আমরা পালিয়ে এসে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করে ফেলেছি। আমি প্রাণপণে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলাম। আমাদের মতো গাধাদের রক্ষা করার জন্যে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো মাথাব্যথা নেই, সারা পৃথিবীতে তাঁর আরো অনেক বড় বড় কাজ আছে, কিন্তু কী কারণ জানি না আল্লাহ তাঁর এত জরুরি কাজকর্মের মাঝেও আমাদের দোয়াটা শুনে ফেললেন। ঠিক তখন ট্রেনটা হঠাৎ একটা স্টেশনে এসে ঢুকল, তারপর হুইসেল দিয়ে থামতে শুরু করল। ট্রেনটা যদি না থামত কী হত আমরা জানি না—জানার কোনো ইচ্ছাও নেই, কিন্তু ট্রেনটা পুরোপুরি থেমে যাবার আগেই আমরা খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। চলন্ত ট্রেন থেকে নামার একটা কায়দা আছে, আমরা সেই কায়দাটা জানি না বলে একজনের ওপর আরেকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার ঘটিয়ে ফেললাম, কিন্তু সেটা নিয়েও চিন্তা করার কোনো সময় নেই। আমরা কোনোভাবে উঠে ছুটতে শুরু করলাম। কোনদিকে ছুটছি কীভাবে ছুটছি ভালো করে জানি না, কিন্তু একেবারে প্রাণ নিয়ে ছুটছি। পিছনে মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, আমাদের ধরতে পারলে নিশ্চয়ই পিটিয়ে ভর্তা করে ফেলবে। দিনদুপুরে ট্রেনের ভেতর থেকে পাঁচ জন মিলে একটা বাচ্চা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা খুব ছোটখাটো অপরাধ নয়। আমরা প্রাণ নিয়ে ছুটতে থাকি।

যখন আমরা শুধুমাত্র কপাল জোরে বেঁচে গেলাম এবং কান ধরে প্রতিজ্ঞা করলাম এই জীবনে আর কোনো অ্যাডভেঞ্চার নয়।

কোনদিকে কতক্ষণ ছুটেছি নিজেরাও ভালো করে জানি না। একসময় আবিষ্কার করলাম আমরা মোটামুটি একটা নদীর ধারে কিছু ঝোপঝাড়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। যারা পিছনে ধাওয়া করছিল তারা নিশ্চয়ই ফিরে গেছে কারণ পিছনে এখন কেউ নেই। আমরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে বোকার মতো একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলাম। জয়ন্তের কপালের কাছে খানিকটা জায়গা ডিমের মতো ফুলে উঠেছে। কাজলের কনুই থেকে ছাল উঠে গেছে। তারেকের পকেটটা ছিঁড়ে উল্টো হয়ে ঝুলছে। কাসেমের হাঁটুর কাছে প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে। ট্রেন থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে আমার হাতের তালুতে চামড়া উঠে গেছে। ঠিক কী কারণ জানি না ঘাড়ের কাছেও টনটন করছে।

কাজল সবার দিকে একবার তাকিয়ে তারেকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "তোর জন্যে—তোর জন্যে এখন আমাদের এই অবস্থা।"

তারেক কেমন যেন কাচুমাচু হয়ে গেল, বলল, "আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি।"

আমার তারেকের জন্যে একটু মায়া লাগল, কাজলকে বললাম, "শুধু শুধু তারেককে কেন দোষ দিচ্ছিস?"

কাজল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "শুধু তারেক না—তুইও দায়ী। তোদের দুইজনের জন্যে আজ এখন আমাদের এই অবস্থা। আরেকটু হলে এক-ট্রেন পাবলিকের কিল খেয়ে আমরা ভর্তা হয়ে যেতাম।"

তারেক সরাসরি নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু আমি তো তারেক না। আমরা যত বড় অপরাধই করি না কেন কখনো নিজের দোষ স্বীকার করি না, এখানেও করলাম না। গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে বললাম, "আমি তোদের পায়ে সেধে আসতে বলেছিলাম? তোরা নিজেরা আসিস নাই?"

কাজল গলার স্বর আরো এক ডিগ্রি ওপরে তুলে বলল, "তুই না নিজের চোখে দেখলি একজন কিডন্যাপার মেয়েটার মাথায় রিভলবার ধরে রেখেছে। দেখিস নাই?"

"যেটা দেখেছি সেটা বলেছি।" আমি গলার স্বর আরো ওপরে তুলে বললাম, "আমি কেমন করে জানব মেয়ের বাবা মেয়ের বেণী ধরে টেনে রাখে? বেণীটাকে রিভলবারের নল মনে হতে পারে না?"

"তোর মতো গাধার কাছে পারে।"

"কী বললি? আমি গাধা?" আরেকটু হলে আমি কাজলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলাম। অন্যেরা আমাকে ধরে রাখল। কাসেম ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা এখন পড়েছি গাড্ডার মাঝে, আর তোরা বেকুবের মতো ঝগড়া করছিস?"

অত্যন্ত সত্যি কথা। কাসেম যথাসম্ভব কম কথা বলে, নাক দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করেই কাজ চালিয়ে দেয়—যখন এক-আধটি কথা বলে সেটা সবারই মন দিয়ে শোনার কথা। আমরা তাই এবারে নড়েচড়ে বসলাম। জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, "কাসেম ঠিক কথাই বলেছে। আমরা পড়েছি আসল গাড্ডার মাঝে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কী করবি?"

কেউ কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। কাজল একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আর ফিরে যেতে পারব না। আব্বু আমাকে খুন করে ফেলবে।"

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। আমাদের সবারই একই অবস্থা। বাসায় ফিরে যাবার পর কেউ আমাদের আস্ত রাখবে না, কেটে দশ টুকরা করে ফেলবে। তারেক বলল, "কিন্তু আমাডের টো বাসায় যেটে হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "সেটা ঠিক। বাসায় তো যেতে হবে।"

তারেক বলল, "যট ডেরি হবে টট বেশি চিন্টা করবে।"

জয়ন্ত বলল, "তা ঠিক।"

তারেক বলল, "টা হলে চল রওনা ডেই।"

আমি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "চল।"

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম এবং তখন আবিষ্কার করলাম তারেকের পা মচকে গেছে, পা-টা লাল হয়ে ফুলেও উঠেছে। হাঁটতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছিল, দাঁতে দাঁত কামড়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে সে হাঁটতে লাগল। লোকজনের ধাওয়া খেয়ে কোন দিকে ছুটেছিলাম মনে নেই, আন্দাজে ভর করে আবার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। খানিকক্ষণ হেঁটে একটা সড়কের মতো পাওয়া গেল, আরো খানিকক্ষণ হেঁটে একটা ছোট বাজারের মতো জায়গায় চলে এলাম। আমরা ভয়ে ভয়ে মানুষের দিকে তাকাই, যাকেই দেখি তাকেই মনে হয় সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তখন কাসেম বলল, "খিদে পেয়েছে।"

কাসেম কম কথার মানুষ কাজেই যখন সে একটি-দুটি কথা বলে সেটা আমরা সবাই গুরুত্ব দিয়ে শুনি। কাসেমের শরীরটা একটা রেল ইঞ্জিনের মতো। একটু পরে পরে তার খিদে পেলে অবাক হবার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমাদেরও খিদে পেয়েছে। এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করলে যে কোনো মানুষের খিদে পাবে।

জয়ন্ত হিসাব করে বলল, "আমাদের কাছে ছিল বিরানব্বই টাকা, তার মাঝে বাহান্ন টাকা দিয়েছি স্কুটার ভাড়া। বাকি আছে চল্লিশ টাকা। পাঁচ জন মানুষ এক এক জনের ভাগে পড়ে আট টাকা।"

কাজল বলল, "আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "এই টাকা দিয়ে ফিরে যেতে পারবি না। সেইটার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কী ব্যবস্থা? কাউকে ছিনতাই করব? নাকি ভিক্ষা করব?"

"আমি জানি না।"

তারেক বলল, "বাসায় ফোন করা যেটে পারে।"

আমরা সবাই একসাথে নিশ্বাস ফেললাম, বাসায় ফোন করার পর আমাদের কী অবস্থা হবে সেটা চিন্তা করে আমাদের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

তারেক বলল, "বাসায় নিশ্চয়ই এখন চিন্টা করছে।"

আমরা আবার একটা নিশ্বাস ফেললাম। কাসেম বলল, "আগে কিছু একটা খেয়ে নেই।"

আমরা কাসেমের পিছু পিছু চায়ের দোকানে ঢুকে গেলাম। খুব হিসাব করে খাবার অর্ডার দেওয়া হল কিন্তু একটু পরেই আমরা আবিষ্কার করলাম এত হিসাব করে অর্ডার না দিলেও ক্ষতি ছিল না—কারণ খাবারের বিল আমাদের দিতে হল না। আমরা যখন খাওয়া শেষ করে কী করব সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি তখন চায়ের দোকানে দুইজন পুলিশ উঁকি দিল। পুলিশ দেখেই আমাদের আত্মা শুকিয়ে গেছে, কোনদিকে দৌড় দেওয়া যায় সেটা বোঝার চেষ্টা করছি তখন পুলিশ দুইজন ভিতরে এসে ঢুকল। আমরা মনে মনে আশা করছিলাম পুলিশ অন্য কাজে এসেছে কিন্তু দেখা গেল সেটা সত্যি নয়—তারা আমাদের কাছেই এসেছে। সোজাসুজি আমাদের টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা? এখানে কী করছ?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "ডালপুরি খাচ্ছি।"

পুলিশটা আমার দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে বলল, "আমার সাথে মস্করা কর?"

আমি দুর্বলভাবে মাথা নাড়লাম, "জি না।"

"কোথা থেকে এসেছ?"

"ঢাকা থেকে।"

"কেন এসেছ?"

জয়ন্ত বলল, "বেড়াতে।"

"তা হলে নদীর দিকে দৌড়াচ্ছিলে কেন?"

আমরা চুপ করে রইলাম। নদীর দিকে কেন দৌড়াচ্ছিলাম তার ব্যাখ্যাটা সহজ নয়—ব্যাখ্যাটা দেওয়া হলে বিপদ আবারো দশগুণ বেড়ে যাবে। দুই নম্বর পুলিশটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার কাছে এসে আমার ব্যাকপেকটায় খোঁচা দিয়ে বলল, "এর ভিতরে কী?"

"বই।"

পুলিশটা মুখ ভেংচে বলল, "বই! আমি যেন আর জানি না কী আছে ভিতরে।"

এতক্ষণে আমাদের ঘিরে বিশাল ভিড় জমে গেছে। সবাই অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, ফিসফিস করে কথা বলছে। দুই নম্বর পুলিশটা হুঙ্কার দিয়ে বলল, "খোল ব্যাগ।"

আমি ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিলাম তখন প্রথম পুলিশটা বলল, "থাক এখানে খুলে কাজ নেই। থানায় নিয়ে যাই।"

"থানায়!" ভয়ে আমাদের আত্মা শুকিয়ে গেল, বললাম, "থানায় কেন?"

পুলিশটা মুখ ভেংচে বলল, "চোর-ডাকাত-পকেটমারকে থানায় কেন নেয় তোমরা জান না?"

চায়ের দোকান থেকে বের হবার সময় দোকানের ম্যানেজার মিনমিন করে বলল, "বিলটা—"

পুলিশ তখন তাকে এমন একটা ধমক দিল যে সে বেচারা একেবারে কাচুমাচু হয়ে গেল।

আমাদের যখন থানায় নিচ্ছে তখন আমাদের পিছনে ছোটখাটো মিছিল। সবাই কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছে। শুনতে পেলাম তারা ফিসফিস করে বলছে, "সন্ত্রাসী", "স্মাগলার", "পিচ্চি ডাকাত", "টেররিস্ট", "তালেবান"—জীবনে কখনো চিন্তা করি নি আমাদের এরকম একটা অবস্থা হতে পারে। থানার ভিতরে ঢুকিয়ে নেবার পর মিছিলের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সেখানে একজন পুলিশ অফিসার বসে খুব মনোযোগ দিয়ে নাক খুঁটছেন—আমাদের দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা?"

প্রথম পুলিশটা বলল, "এখনো জানি না স্যার। সত্যি কথা স্বীকার করতে চায় না। কিছু মনে হয় গোলমাল আছে।"

দুই নম্বর পুলিশটা বলল, "ধরে একটু বানালে স্বীকার করবে।"

"ব্যাগের ভিতরে কী?"

আমি বললাম, "বই-খাতা।"

দুই নম্বর পুলিশটা দাঁত বের করে বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে বলল, "হে হে হে। কী রকম বই-খাতা?"

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই পুলিশটা টান দিয়ে আমার ব্যাকপেকটা নিয়ে সেটা খুলে উপুড় করে ফেলল। সাথে সাথে ভেতর থেকে আমার বই-খাতা-পেন্সিলের সাথে সাথে ক্রিকেট বল, চিউয়িংগাম, ডিকেটটিভ বই, ইলাস্টিক ব্যান্ড, স্টিলের স্প্রিং, ফিল্মের কার্টিজ, ওষুধের খালি কৌটা, ভাঙা ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ব্যাটম্যান স্টিকার, খাবার সোডার কৌটা এবং ভিনেগারের শিশি বের হয়ে এল। সমস্যাটা আরো বাড়ানোর জন্যেই মনে হয় ভিনেগারের শিশিটা ভেঙে ঘরে একটা ঝাঁজালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

পুলিশটা লাফ দিয়ে পিছনে সরে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "এসিড! এসিড!!"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, ভিনেগার।"

"ভিনেগার কেন তোমার ব্যাগে?"

এই উত্তর আমি কেমন করে দেব? কারো খাবার পানিতে যদি লুকিয়ে একটু ভিনেগার মিশিয়ে দেওয়া যায় তখন পানি খেয়ে তার মুখের অবস্থাটা কেমন হয় সেটা দেখা যে কী আনন্দের একটি ব্যাপার সেটা আমি কেমন করে এই পুলিশকে বোঝাব?

পুলিশটা এবারে খাবার সোডার প্লাস্টিকের প্যাকেটটা সাবধানে দুই আঙুল দিয়ে ধরে বলল, "এইটা কী? হেরোইন?"

"না।" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "এইটা খাবার সোডা।"

"খাবার সোডা?" পুলিশটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। "খাবার সোডা কেন?"

খাবার সোডার সাথে ভিনেগার মেশালে যে একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ঘটে সেটাইবা আমি এই পুলিশকে কেমন করে বোঝাব! আমি তবুও চেষ্টা করতে শুরু করছিলাম, তখন ক্যামেরা হাতে একজন মানুষ হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকল। যে পুলিশ অফিসারটা খুব মনোযোগ দিয়ে নাক খুঁটছিল সে এবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী খবর সাংবাদিক ভাই? এইখানে কী মনে করে?"

মানুষটা ক্যামেরার লেন্স ঠিক করতে করতে বলল, "আপনারা নাকি একটা স্মাগলারের গ্যাং ধরেছেন হাতেনাতে?"

"এখনো জানি না—" পুলিশ অফিসার আবার নাক খুঁটতে শুরু করল।

"কোথায়?" ক্যামেরা হাতের মানুষটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এরা নাকি?"

পুলিশ অফিসারটা মাথা নাড়ল। আমরা সবাই একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, শুধু যে পুলিশ আমাদের ধরে এনেছে তাই নয়—এখন কালকে সব পত্রিকায় আমাদের ছবি বের হবে। আমাদের কোমর দড়ি দিয়ে বাঁধা, সামনে আমার খাবারের সোডা আর ভিনেগারের শিশি। পত্রিকায় খবরের হেডলাইন হবে "বিষাক্ত কেমিক্যালসহ পিচ্চি সন্ত্রাসী"।

সাংবাদিক মানুষটি আমাদের একনজর দেখে বলল, "এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে ধরে এনেছেন কেন? আসল চোর-ডাকাত ধরতে পারেন না, বাচ্চাকাচ্চাদের হয়রানি?"

এই প্রথমবার আমরা একটু সাহস পেলাম। সাংবাদিক মানুষটার মনে হয় একটু মায়াদয়া আছে। পুলিশ অফিসার চোখ পিটপিট করে বলল, "হয়রানি কে বলেছে? একটু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে—"

"ফাজলেমি পেয়েছেন? এইটুকুন বাচ্চাদের জিজ্ঞাসাবাদ?"

যে পুলিশটা আমার ব্যাগ থেকে সবকিছু উপুড় করে ফেলে দিয়েছে সে মিনমিন করে বলল, "রিপোর্ট পেয়েছি এরা নদীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে—"

সাংবাদিক মানুষটা ধমক দিয়ে বলল, "সেইজন্যে ধরে নিয়ে এসেছেন? এই দেশে বাচ্চাছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে না? আশি বছরের বুড়োরা দৌড়াবে?"

সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই খুব ক্ষমতাশালী মানুষ—তার ধমক খেয়ে পুলিশগুলো কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সাংবাদিক মানুষটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা তো এই এলাকার না—আগে দেখি নি। কোথা থেকে এসেছ?"

আমি বললাম, "ঢাকা থেকে।"

"কী মনে করে?"

আমি বললাম, "ইয়ে—মানে—হয়েছে কী—আসলে—" তখন জয়ন্ত আমাকে রক্ষা করল—শুধু আমাকে না আমাদের সবাইকে। মুখটা গম্ভীর করে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চোখ-মুখে একটা উদাস ভাব ফুটিয়ে বলল, "আপনারা তো সাংবাদিক। আমাদের জীবনের কষ্টটা কি আপনারা জানেন?"

সাংবাদিক মানুষটা থতমত খেয়ে বলল, "কী কষ্ট?"

"এই যে দেখেন, এখানে কী খোলামেলা, সামনে ধানক্ষেত, একদিকে নদী। নীল আকাশ—"

সাংবাদিক মানুষটা খোলামেলা ধানক্ষেত এবং নীল আকাশের সাথে আমাদের জীবনের কষ্টটা তখনো বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত বলল, "আমাদের ঢাকায় এগুলো নেই। খালি কংক্রিটের দালান, গাড়ির ধোঁয়া আর মানুষের ভিড়। আমাদের জীবনে কোনো আনন্দ নেই। আমরা স্কুলে যাই আর বাসায় আসি। বাসায় এসে পড়ি। পড়া আর পড়া।"

সাংবাদিক মানুষটি বলল, "ছাত্রজীবনে তো একটু পড়তেই হয়।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, "কিন্তু আমাদের জীবনে কি পড়াশোনা ছাড়া অন্যকিছু আছে? নেই।"

জয়ন্ত একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে মুখটা আরো উদাস উদাস করে তারেককে দেখিয়ে বলল, "দেখেন, আমেরিকা থেকে আমাদের এই বন্ধু আমাদের স্কুলে এসেছে।"

সাংবাদিক ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বলল, "আমেরিকা থেকে এসেছে নাকি?"

আমি তারেককে খোঁচা দিয়ে বললাম, "তুই একটু বল কোথা থেকে এসেছিস। খামাখা বাংলায় চেষ্টা করিস না—ইংরেজিতেই বল।"

তারেক কী বলবে বুঝতে না পেরে ইংরেজিতে কিছু একটা বলল, তার খাঁটি আমেরিকান উচ্চারণ শুনে সাংবাদিক আর পুলিশগুলোর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। জয়ন্ত তার চেহারার মাঝে আরো একটু উদাসী ভাব এনে বলল, "আমাদের এই আমেরিকার বন্ধু বলল, সারা জীবন শুনেছি বাংলাদেশ এত সুন্দর! নদী খালবিল ধানক্ষেত নীল আকাশ। কোথায় সেসব? শুধু দেখি কংক্রিটের দালান আর মানুষ আর গাড়ির ধোঁয়া।" জয়ন্ত একটু থেমে বলল, "আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুই দেখতে চাস? তারেক বলল, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম—"

জয়ন্ত কী বলতে চাইছে আমরা এখন ধরে ফেলেছি। আমি তাই জয়ন্তের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "কিন্তু সেটা দেখতে হলে তো গ্রামে যেতে হবে। শহরের বাইরে যেতে হবে।"

কাজলও এবার যোগ দিল, বলল, "কিন্তু আমাদের আব্বা-আম্মা তো পারমিশন দেবে না।"

জয়ন্ত বলল, "তখন আমি বললাম, পৃথিবীর আরেক মাথা থেকে এই ছেলে এই দেশে এসেছে—দরকার হলে পারমিশন ছাড়াই যাব।"

আমি বললাম, "একটু অ্যাডভেঞ্চারও হবে—"

সবাই কথা বলছে তাই কাসেমও যোগ দিল, সে নাক দিয়ে ঘ্রোঁত করে একবার শব্দ করল। সাংবাদিক মানুষটা অবাক হয়ে কাসেমের দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

আমি বললাম, "আমরা তাই একদিন ট্রেনে উঠলাম। ঠিক করলাম যে জায়গাটা সুন্দর দেখাবে সেখানে নেমে যাব।"

জয়ন্ত বলল, "এই জায়গাটা মনে হল অপূর্ব! ট্রেনটা একটু থামতেই নেমে গেলাম। একজন বলল এখানে নদী আছে—"

কাজল বলল, "সেটা শুনে আমরা দৌড়াতে লাগলাম।"

কাসেম বলল, "ঘ্রোঁত ঘ্রোঁত!"

সাংবাদিকটা এতক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল, সেগুলো ঠিক বিশ্বাস করছিল কি না বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে মনে হল তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের ছায়া পড়ল, চোখ বড় বড় করে বলল, "চমৎকার একটা স্টোরি হয় এটা দিয়ে!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়?"

"স্টোরি। নিউজপেপারে একটা নিউজ।" সাংবাদিক মানুষটা হাত নেড়ে বলল, "নিউজ ক্যাপশন, অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে পাঁচ কিশোর : নগরের রুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির অন্বেষায়! নিচে থাকবে তোমাদের পাঁচ জনের ছবি।"

আমরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম, বাড়ি থেকে পালিয়েছি সেই খবর পত্রিকায় ছাপা হলে আমাদের কি আর কোনো মুক্তি পাবার উপায় থাকবে?

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, সাংবাদিক তার ক্যামেরা খুলে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ছবি তোলা শুরু করেছে! আমরা আর কী করি 'নগরীর রুদ্ধ জীবনে' আটকে থাকলে মুখে যেরকম অস্থির ব্যাকুল একটা ভাব ফোটানোর কথা সেরকম ভাব ফুটিয়ে রাখলাম।

তবে একটা লাভ হল। সাংবাদিক মানুষটি নিজেই আমাদের ঢাকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিল।

বাসায় পৌঁছানোর পর যা একটা অবস্থা হল সেটা আর বলার মতো না! আমরা অবশ্য নিজের বিষয়টা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করি নি, সবাই ভাবছিলাম তারেকের কথা। তাকে এক সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছিল—এই সময়টাতে তাকে আমাদের স্কুল বন্ধুবান্ধব দেশ সবকিছু নিয়ে একটা ভালো ধারণা দেওয়ার কথা। সেরকম কিছু তো দেওয়া হলই না উল্টো বাড়ি থেকে পালানো, পাবলিকের পিটুনি থেকে কোনোরকমে রক্ষা, পুলিশের হাতে ধরা পড়া, পত্রিকায় ছবিসহ নিউজ—সব মিলিয়ে একজন মানুষকে এর থেকে বেশি অপমান আর কীভাবে করা যায় কে জানে!

আমরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলাম তারেক আর কোনোদিন স্কুলে ফিরে আসবে না। স্কুল দূরে থাকুক—নিশ্চয়ই দেশ থেকে পালাবে।

কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো! পুরো ব্যাপারটা তারেকের এত পছন্দ হল যে সে আর বলার মতো না। সব যখন মিটে গেছে তখন সে খালি দুলে দুলে হাসে আর বলে, "আমাডের কী মজা হয়েছিল, টাই না?"

আমরা আর কী বলব, বলি, "হয়েছিল নাকি?"

"হয়েছিল না? একেবারে ফাটাফাটি মজা।"

ফাটাফাটি শব্দটা তারেক নূতন শিখেছে, একটু পরে পরে ব্যবহার করে! দরকার থাকলেও করে, না থাকলেও করে।

যখন হেডমাস্টার এমন একটা চিঠি দিলেন যেটা অবিশ্বাস্য এবং আমি যেই চিঠির কারণে একটু বেকুবি করে ফেললাম।

কিডন্যাপারের হাত থেকে একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা যে বেকুবিটা করেছিলাম তার যন্ত্রণা মনে হয় আমাদের সারা জীবন সহ্য করতে হবে। প্রথমে প্রত্যেকের বাসায় একটা ধাক্কা, কারো কারো শক্ত পিটুনি, কারো কারো জীবন নষ্ট করে দেওয়া বকুনি, কারো কারো বেলা স্কুলে যাওয়া এবং আসা ছাড়া বাসা থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ। পত্রিকায় ছবিসহ আমাদের খবরটা বের হওয়ার কারণে সেটা শুধু স্কুলের সবাই না, মনে হয় বাংলাদেশের সবাই জেনে গেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে অনেক সময় শুনি ফিসফিস করে লোকজন বলাবলি করে, "এই যে এরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল!" আমাদের স্কুলে নূতন কেউ

এলেই তারা আমাদের খোঁজ করে দেখতে চান। ক্লাসে স্যারেরা পড়ানোর সময় দুষ্টু এবং পাজি ছেলের উদাহরণ দিতে হলে আমাদের উদাহরণ দেন—সব মিলিয়ে একটা ভয়াবহ যন্ত্রণা!

যাই হোক, সারাটা বছর এভাবে কেটে গেল। তারেক আসার পর সাদিবের কিটিশ মিটিশ করে ইংরেজি বলা বন্ধ হয়েছে—এখন সে বাংলাতেই বেশিরভাগ সময় কথা বলে কিন্তু অনেক দিন এরকম আজগুবি ভাষায় ইংরেজি বলতে বলতে তার উচ্চারণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে—তার বাংলাটাকেও এখন অদ্ভুত শোনায়। কাজল আগের মতোই আছে। তার খবিশ অভ্যাসগুলো একটুও কমে নি, কিছু কিছু বরং বেড়ে গেছে। যেমন কয়েকদিন হল যখন তার ইচ্ছে হয় তখনই বগলে হাত দিয়ে হাত নাড়িয়ে প্যাঁতপ্যাঁত করে বাজে এক ধরনের শব্দ বের করতে থাকে! কয়দিন থেকে সে ছিলকেসহ বাদাম কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া প্র্যাকটিস করছে—কেন তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। জয়ন্ত পরীক্ষার ভিতরে লুকিয়ে পুরো একটি উপন্যাস লিখে শেষ করেছে। উপন্যাসের নাম "নীল নয়নার ভালবাসা"—আমাদের কয়েকজনকে পড়তে দিয়েছে, একেবারে ফাটাফাটি উপন্যাস কিন্তু বড়দের হাতে ধরা পড়লে এই উপন্যাস লেখার জন্যে জয়ন্তের পিটুনি খেয়ে পিঠের ছাল উঠে যাওয়ার চান্স আছে। কাসেমকে দেখে মনে হয় সে আগের মতোই আছে কিন্তু আসলে তার শরীরটা এখন একেবারে লোহার মতো শক্ত। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি, যদি কখনো কাসেমের অসুখ হয় আর ডাক্তার কাসেমের হাতে ইনজেকশন দেওয়ার চেষ্টা করেন তা হলে ইনজেকশনের সুঁই বাঁকা হয়ে যাবে। তবে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে তারেকের—আগে ঝালমুড়ি পর্যন্ত খেতে পারত না, এখন কাঁচামরিচ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। তার বাংলার অনেক উন্নতি হয়েছে, "খায়া ফালাইছি", "ঠ্যাং ভাইঙ্গা ফালামু" কিংবা "ধুর বান্দরের বাচ্চা" আজকাল সে এই রকম কথাও বলতে পারে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত তাকে ট আর ত-এর পার্থক্য শেখানো যায় নি। সে এখনো বোতলকে বলে বোটল, চিন্তাকে বলে চিন্টা! প্রথম বাংলা পরীক্ষায় তারেক ফেল করেছিল, ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় টেনেটুনে পাস—ফাইনাল পরীক্ষায় প্রায় কাজলের সমান সমান মার্কস। (অবিশ্যি কাজলের সমান মার্কস পাওয়া এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না!)

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হবার পর মাসখানেক ছুটি। তখন কী করা হবে সেটা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছি তখন একটা খুব আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একদিন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন। স্কুলের হেডমাস্টার বাসায় খবর পাঠিয়ে ডেকে পাঠানো খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কোনো একটা বড় ধরনের অপরাধ না করলে হেডমাস্টার কখনো এইভাবে ডেকে পাঠান না। আমি অনেক চিন্তা করেও কী অপরাধ করেছি মনে করতে পারলাম না। ফাইনাল পরীক্ষায় সরল অংকের উত্তরটা সাদিবের সাথে মেলানোর জন্যে ফিসফিস করে তার কাছে উত্তরটা জানতে চেয়েছিলাম। তখন বারেক স্যার আমাকে একটা রাম ধমক দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা তো তখনই মিটে গিয়েছিল। এই জন্যে কি হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করে আমার পুরো পরীক্ষাটাই ক্যান্সেল করে দিয়েছে? এখন স্কুল থেকে টি.সি. দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে? ভয়ে আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে গেল।

স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানে তারেক, কাজল, কাসেম আর জয়ন্তও শুকনো মুখে অপেক্ষা করছে—তাদেরকেও নাকি হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন। সর্বনাশ! আমরা এই পাঁচ জনই কিডন্যাপারের হাত থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মহা গাড্ডার মাঝে পড়েছিলাম। এখন নিশ্চয়ই সেটা নিয়েই নতুন কোনো ঝামেলা হয়েছে। মেয়ের বাবা নিশ্চয়ই পত্রিকায় আমাদের ছবি দেখে পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়েছে, পুলিশ খবর দিয়েছে হেডমাস্টারকে, হেডমাস্টার আমাদের খবর দিয়েছেন। আমরা হেডমাস্টারের ঘরে ঢোকা মাত্র পুলিশ ক্যাঁক করে আমাদের ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে—বাকি জীবনটা হয়তো আমাদের জেলখানাতেই কাটাতে হবে।

আমরা যখন শুকনো মুখে জল্পনা-কল্পনা করছি তখন স্কুলের দপ্তরি কালীপদ আমাদেরকে হেডমাস্টারের রুমে ডেকে পাঠাল। উঠে একটা দৌড় দিয়ে স্কুল থেকে ছুটে পালাব কি না চিন্তা করছিলাম কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। স্যার ঘরের ভেতর থেকে হুঙ্কার দিলেন, "বাইরে কে? ভিতরে আয়।"

আমরা সব আশা ছেড়ে দিয়ে তখন একজন একজন করে ভিতরে ঢুকলাম। হেডস্যার আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "এই তা হলে সেই পাঁচ রত্ন! পঞ্চ পাণ্ডব? পাঞ্জা বাহিনী?"

কথাটার অর্থ ভালো-মন্দ যা কিছু হতে পারে। আমরা তাই কিছু বললাম না। হেডস্যার বললেন, "এই পঞ্চ পাণ্ডব কি আর কোনো অ্যাডভেঞ্চার করেছে? বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আর কিছু অঘটন ঘটিয়েছে?"

আমরা পাঁচ জন সজোরে মাথা নাড়লাম, জানালাম যে আমরা আর কিছুই করি নি। হেডস্যার বললেন, "আগের যুগে যখন কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁদরামো করত তখন তাদের ধরে পাছায় এমন বেত মারা হত যে তারা জন্মের মতো সিধে হয়ে যেত। এখন কী করা হয়?" হেডস্যার মুখ বিকৃত করে প্রায় বমি করে দেবেন এরকম ভঙ্গি করে বললেন, "এখন তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়!"

আমরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম, আমাদেরকে তো কেউ পুরস্কার দেয় নি! পাছায় বেত মারা না হলেও তার কাছাকাছি যাওয়া হয়েছে।

হেডস্যার মুখটা বিকৃত রেখেই টেবিল থেকে একটা খাম তুলে বললেন, "এই চিঠিটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে আমার ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। কেন সেটা করি নাই আমি সেইটা জানি না—কেন আমি তোদের ডেকে এনেছি সেইটাও জানি না।"

হেডস্যার এমনভাবে চিঠিটা ধরে রাখলেন যেন তিনি একটা বিষাক্ত সাপ ধরে রেখেছেন। মুখটা কুঁচকে রেখেই খামটা খুলে বললেন, "বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতি তোদের নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।"

আমরা এবার চমকে উঠলাম, জয়ন্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "কী লিখেছে স্যার চিঠিতে?"

"লিখেছে তারা ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সাত দিনের জন্যে সুন্দরবনে যাচ্ছে। তোদের পাঁচ জনকে তারা সাথে নিয়ে যাবে।"

আমার কথাটা বিশ্বাস হল না। মনে হল ভুল শুনছি! বললাম, "আ-আমাদের নিবে?"

"হ্যাঁ। দুঃসাহসিক অভিযান করার জন্যে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলি তার পুরস্কার—" স্যার মুখ কুঁচকে চিঠিটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, মনে হল একটা ময়লার বালতি আমাদের দিকে ধরে রেখেছেন, বললেন, "নে ধর। এখান থেকে ভাগ—আর যেন তোদের মুখ আমার কোনোদিন দেখতে না হয়।"

আমি প্রায় ছোঁ মেরে হেডস্যারের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে এক দৌড়ে বের হয়ে এলাম। আমার পিছু সবাই হুটোপুটি করে বের হল বাইরে। চিঠিটা নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল, আরেকটু হলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত, অনেক কষ্টে আমি কোনোমতে সবাইকে থামালাম। কাজল বলল, "পড়। কী লেখা আছে পড়।"

আমি পড়তে শুরু করলাম, ওপরে আমাদের পাঁচ জনের নাম লেখা, তার নিচে লিখেছে :

আমার ক্ষুদে বন্ধুরা :

সম্প্রতি খবরের কাগজে আমরা দেখতে পেয়েছি তোমাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে তোমরা তোমাদের ঘর থেকে পালিয়েছিলে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে। আমরা জানি তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আরো অনেক কিছু করতে চায় কিন্তু সুযোগের অভাবে তোমরা কিছু করতে পার না।

আমরা বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতির পক্ষ থেকে সাত দিনের জন্যে সুন্দরবনে এক অভিযানে যাচ্ছি। বিশাল এক জাহাজে আমরা সুন্দরবনের গহিনে হারিয়ে যাব। এই জাহাজেই আমরা থাকব, খাব এবং ঘুমাব। আমাদের সাথে থাকবেন বাংলাদেশের কিছু প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গায়ক এবং শিল্পী। এ ছাড়াও থাকবে টেলিভিশন ক্রু। সীমিত সংখ্যক অভিযাত্রীকে এই জাহাজে নেওয়া হবে—থাকা-খাওয়া এবং ভ্রমণের খরচ বাবদ সবাইকে পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হবে।

তবে তোমরা পাঁচ ক্ষুদে বন্ধু যারা অ্যাডভেঞ্চার করার জন্যে বাসা থেকে পালিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েছিলে তাদের জন্যে পুরো খরচ আমরা বহন করব।

তোমরা যদি এই অভিযানে অংশ নিতে চাও ডিসেম্বরের ৭ তারিখের মাঝে আমাদের সাথে যোগাযোগ কোরো। বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতি সম্পর্কে জানার জন্যে আরো কিছু তথ্য তোমাদের কাছে পাঠানো হল।

শুভেচ্ছান্তে
কায়সুল ইসলাম জুয়েল
সমন্বয়কারী
সুন্দরবন অভিযাত্রী দল

চিঠি শেষ করে আমি জয়ন্ত আর কাজল আনন্দে লাফাতে থাকি, কাসেম কখনোই আনন্দে লাফালাফি করে না কিন্তু এই প্রথমবার আমরা তাকে সবগুলো দাঁত বের করে হাসতে দেখলাম। শুধু তারেক গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের লাফঝাঁপ একটু কমে আসার পর তারেক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে মনে হয় যেটে ডিবে না।"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "কেন যেতে দিবে না?"

"কোনো গার্জিয়ান নাই সেইজন্যে।"

"গার্জিয়ান? গার্জিয়ান কেন লাগবে? এত বড় অভিযাত্রী দল যাচ্ছে—বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক যাচ্ছে, যেতে দিবে না কেন? একশ'বার যেতে দিবে।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারেকের কথাই ঠিক। কাজলের বাসা থেকে সাফ সাফ বলে দেওয়া হল সুন্দরবন দূরে থাকুক বেহেশতে ঘুরে আসার ফ্রি টিকিট দেওয়া হলেও কাজলকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে না। সে এখন পর্যন্ত যত বদমাইশি করেছে তার শাস্তি হিসেবে তাকে জীবনেও আর কখনো ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হবে না! কাসেমকে বলা হল যেহেতু সাথে কোনো বড় মানুষ যাচ্ছে না তাই তাকে যেতে দেওয়া হবে না। কাসেম খুব বেশি কথা বলে না, তারপরেও সে একবার চেষ্টা করল, সে বলল তিন-চার জন বড় মানুষ থেকে তার গায়ে জোর বেশি। সে ইচ্ছা করলে দুই-চার জন বড় মানুষকে এক হাত দিয়ে ছুড়ে দিতে পারবে। কাজেই বড় মানুষ সাথে নিতে হবে কেন? তখন তার আম্মা কাসেমের কান ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলেছেন, "শুধু গায়ের জোর থাকলেই কি হয়? বড় মানুষ থাকতে হয় দায়িত্বের জন্যে।" (কোনো মানুষ কাসেমের কান ধরে হ্যাঁচকা টান দিতে পারে ব্যাপারটাই আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কাসেম নিজে বলেছে তাই আমরা অবিশ্বাস করি কেমন করে?) জয়ন্ত যখন তার বাসায় বলেছে তখন সেখানেও একই কথা, চেনা-জানা নেই পরিচয় নেই এরকম মানুষজনের সাথে সুন্দরবন চলে যাবে মানে? কোথায় নিয়ে কী বিপদে ফেলে দেবে তার কী গ্যারান্টি আছে?

আমার অবস্থা হল সবচেয়ে ভয়াবহ। আমি যখন বাসায় বললাম আমাদের সুন্দরবনে নেবার জন্যে চিঠি এসেছে তখন আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তোকে সুন্দরবন নেবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?"

আমি বললাম, "শুধু আমাকে না। আমাদের পাঁচ জনকে। এই দেখ চিঠি।"

আমি চিঠিটা আম্মুকে দেখালাম, ফটোকপি করে সবাই বাসায় একটা কপি এনেছি—আম্মু চিঠিটা পড়ে বললেন, "যে কাজের জন্যে আচ্ছা করে পিটুনি দিতে হয় সেই কাজের জন্যে তোদের পুরস্কার দিচ্ছে, ব্যাপারটা কী?"

বড় আপু বলল, "নিশ্চয়ই সন্ত্রাসী অর্গানাইজেশন। এদেরকে বোমা মারা, ককটেল চার্জ করা এইসব শেখাবে।"

পৃথিবীতে বড় বোন জাতীয় জিনিসগুলো কেন যে খোদা তৈরি করেছেন কে জানে। আমি গলার রগ ফুলিয়ে বললাম, "এখানে বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি- সাহিত্যিক-শিল্পীরা যাচ্ছেন!"

বড় আপু বলল, "তা হলে তো আরো সাবধান থাকা উচিত। কবি-সাহিত্যিকরা হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। এদের বইটইগুলি খারাপ না। কিন্তু পার্সোনাল লাইফে এরা খুব ডেঞ্জারাস!" বড় আপু কেমন যেন শিউরে উঠে বলল, "সাত দিন যদি এরা এই ছোট বাচ্চাদের সাথে থাকে তা হলে এদের মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে দেবে। জন্মের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমার ইচ্ছে করল বড় আপুর গলা টিপে ধরি কিন্তু সেটা করা গেল না। কখনোই করা যায় না। আম্মু মনে হয় বড় আপুর কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে নিলেন, মাথা নেড়ে বললেন, "শুধু

শুধু অজায়গায় কুজায়গায় গিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষা শেষ হয়েছে এখন ঘরে বসে ইংরেজি ট্রান্সলেশান কর।"

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না। কোথায় সুন্দরবন আর কোথায় ইংরেজি ট্রান্সলেশান। একবার মনে হল বাসার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে জীবনটা শেষ করে দিই। কিন্তু কাজটা তো এত সোজা না তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে তারেকের সাথে যোগাযোগ করলাম। মনে হল আমাদের সবার মাঝে শুধু তার অবস্থাটাই একটু ভালো। চিঠিটা পাবার পর তার আম্মু বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন—নিজে গিয়ে কায়সুল ইসলাম জুয়েলের সাথে কথা বলে এসেছেন। জুয়েল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে—আর এসব কাজকর্ম করে বেড়ায়। তবে এই প্রতিষ্ঠানে প্রফেসর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এরকম বড় বড় মানুষজন আছে। এর আগেও এরা জাহাজ ভাড়া করে নানা জায়গায় গিয়েছে। আসলেই তাদের সাথে বড় বড় কিছু কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক যাচ্ছে। বিশাল জাহাজের ফ্লোরে শোয়ার ব্যবস্থা করা হবে, সেখানেই রান্না এবং খাওয়া। সাথে কী নিতে হবে সেটারও একটা লিস্ট করে দেবে। সাথে কয়েকজন ডাক্তারও থাকবেন। কাজেই বড় কোনো অঘটন ঘটার কোনো ভয় নেই।

কিন্তু এত সব ভালো ভালো খবর নেওয়ার পরেও তারেকের আম্মু তারেককে যেতে দিচ্ছেন না। সাথে নিজেদের একজন বড় মানুষ না থাকলে খালাম্মা তারেককে যেতে দেবেন না।

আমরা পাঁচ জন একত্র হয়ে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে শলাপরামর্শ করি কিন্তু বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কোনো লাভ হল না। আমি বললাম, "আমি বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে বলব যেতে না দিলে সুইসাইড করব।"

কাজল বলল, "কোনো লাভ হবে না। আমি যদি বলি সুইসাইড করব—আমার আব্বু বলবে করতে চাইলে কর। লাফ দে হারামজাদা।"

জয়ন্ত বলল, "বড় মানুষদের মনে কোনো দয়ামায়া নেই।"

কাসেম বলল, "ঘ্রোঁত।"

শুধু তারেক বলল, "ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাঠায় চিন্টা করটে হবে।"

আমি বললাম, "ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার কী আছে? কী করবি?"

তারেক বলল, "চল, আমরা সাঠে একজন বড় মানুষ নিয়ে যাই।"

"ওরা বড় মানুষকে নিবে কেন—শুধু আমাদের পাঁচ জনকে নিবে।"

জয়ন্ত বলল, "আর বড় মানুষ আমাদের সাথে যেতে রাজি হবে কেন? বড় মানুষেরা সব সময় আমাদের থেকে একশ হাত দূরে থাকে।"

আমি বললাম, "একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "একটু মিথ্যা কথা বলতে হবে।"

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বলল, "এমন ভাব করছিস যে তুই জীবনে মিথ্যা কথা বলিস না!"

আমি রেগে বললাম, "তোর মতো তো আর বলি না।"

জয়ন্ত আরো রেগে বলল, "কোনদিন আমি মিথ্যা কথা বলেছি?"

"সাংবাদিককে সেই গুলপট্টি কে মেরেছিল? সারা দেশের মানুষ তোর গুলপট্টি শুনেছে। শুধু শুনে নাই। বিশ্বাস করেছে!"

"আমি যদি তখন না বলতাম তা হলে তোরা এখনো জেল হাজতে থাকতি!"

আমি আরেকটা কী বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কাসেম আমার ঘাড় ধরে বলল, "ঘিরিংগিবাজি করিস না। কী বলতে চাস বল।"

কাসেম নিশ্চয়ই জোরে ধরে নি, আস্তেই ধরেছে কিন্তু আমার মনে হল মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে। কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে ঘাড় মালিশ করতে করতে বললাম, "আমি বলছিলাম কি, আমাদের সবার বাসাতেই একটা আপত্তি যে আমাদের সাথে নিজেদের কোনো বড় মানুষ যাচ্ছে না। কাজেই আমরা যদি কাল্পনিক একটা মানুষ দাঁড় করাই—"

কাজল বলল, "কাল্পনিক?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। যেমন মনে কর আমি আমার বাসায় বললাম, আমাদের সাথে যাবে তারেকের ছোট চাচা। তারেক তার আম্মুকে বলবে আমাদের সাথে যাবে জয়ন্তের ছোট কাকা। জয়ন্ত বলবে আমাদের সাথে যাবে কাসেমের বড় ভাই। কাসেম বলবে আমাদের সাথে যাবে কাজলের ছোট চাচা। কাজল বলবে আমাদের সাথে যাবে আমার ছোট মামা! তা হলে কেমন হয়?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "বুদ্ধিটা খারাপ না। কিন্তু তারপরেও আমাকে যেতে দেবে না।"

জয়ন্ত বলল, "মিথ্যা কথা যখন বলতেই হবে তখন আরেকটু বলে ফেললে কী হয়?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আরেকটু মানে কী?"

"যেমন ধর আমরা চার জন কাজলের বাসায় গিয়ে বললাম, খালাম্মা আমাদের চার জনকেই বাসা থেকে পারমিশন দিয়েছে এখন আপনি পারমিশন দিলেই পাঁচ জন হয়। তারপর আবার তোরা চার জন এসে আমার বাসায় বলবি যে তোরা সবাই পারমিশন পেয়ে গেছিস এখন আমাকে পারমিশন দিলেই পাঁচ জন হয়। এইভাবে সবার বাসায় সবাই যাব—বলব অন্যরা পারমিশন পেয়ে গেছে!"

কাসেম মাথা নাড়ল, বলল, "ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধি!"

আমি বললাম, "আমি কিছু বললেই একবার আম্মু আরেকবার বড় আপু ঝাড়ি মারে। তোদেরকে তো ঝাড়ি দিতে পারবে না। তোরা যদি সবাই মিলে ঘ্যানঘ্যান শুরু করিস তা হলেই আর না করতে পারবে না।"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম। আরো কিছুক্ষণ আলোচনা হল, তারপর বাসায় গিয়ে দুই নম্বরি পরিকল্পনা কাজে লাগানোর কথা ঠিক করা হল। আমাদের পারমিশন দিলে তো আর মিথ্যা কথা বলার দরকার ছিল না—কিন্তু এখন আর কী করা? বড় মানুষেরাই আমাদের মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করেছে। গুনাহ্ যদি হয় তা হলে সেটা বড় মানুষদেরই হবে।

বাসায় এসে সেদিন সন্ধেবেলা আমি খাবার টেবিলে একটা বিশাল লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "অন্য সবাই সুন্দরবনে যাবার পারমিশন পেয়েছে—শুধু আমি পেলাম না।"

আম্মা বললেন, "অন্য সবাই পেয়েছে?"

আমি বললাম, "পাবে না কেন? সবাই কি আর তোমাদের মতো? তাদের মনে দয়ামায়া আছে।"

আম্মা বললেন, "কারা না কারা কোন বনজঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে আর সবাই রাজি হয়ে গেছে?"

আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, "কারা না কারা না আম্মু—বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতি। কারা এর মেম্বার শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সব বিখ্যাত মানুষেরা আছেন। তুমি তো কোনো পাত্তা দিচ্ছ না। অন্যদের আম্মুরা গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছে, কথা বলে এসেছে।"

অন্যদের আম্মুদের সাথে তুলনা করায় আম্মু মনে হয় একটু থতমত খেয়ে গেলেন, বললেন, "বড়রা কেউ যাচ্ছে না— শুধু নিজেরা নিজেরা তোরা ছোট কয়েকজন যাচ্ছিস, তারপরেও পারমিশন দিয়ে দিল?"

আমি মুখে উদাস উদাস একটা ভাব করে বললাম, "বড়রা কেউ যাচ্ছে না কে বলেছে? তারেকের ছোট চাচা যাচ্ছেন।" এত বড় একটা মিথ্যা কথা সরাসরি আম্মুকে বলতে গিয়ে আমার মুখে কথা আটকে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনোভাবে দাঁতে দাঁত চেপে ধাক্কা দিয়ে বলে ফেললাম।

"তারেকের ছোট চাচা যাচ্ছেন নাকি?" আম্মুকে প্রথমবার একটু নরম হতে দেখলাম। বললেন, "বড় মানুষ একজন সাথে থাকলে অন্য ব্যাপার।"

ঠিক তখন বড় আপু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার করল, বলল, "আম্মু—ইবুর কোনো কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না। তারেকের আম্মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে শিওর হয়ে নাও।"

আম্মু বললেন, "ইবু কি আর আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবে?"

আম্মুর কত বড় বিশ্বাস যে আমি তাঁর সাথে মিথ্যা কথা বলব না। অথচ আমি মিথ্যা কথাই বলেছি, নিজের ওপরে হঠাৎ আমার ঘেন্না ধরে গেল—মনে হল একেবারে মরে যাই। কিন্তু এখন আর কিছু করার উপায় নেই, একটা মিথ্যা কথা বললে একশ'টা মিথ্যা কথা বলতে হয়। শুধু যে মিথ্যা কথা বলতে হয় তাই না— হাজার রকম বিপদের মাঝে পড়তে হয়। এই এখন যেরকম বিপদের মাঝে পড়ে গেলাম। আম্মু হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলত কিন্তু বড় আপু যখন আম্মুকে দিয়ে তারেকের আম্মুকে ফোন করাবে, তখন সত্যি কথাটা বের হয়ে যাবে। তখন আমি কী করব? আমার মনে হয় তখন আসলেই সুইসাইড করতে হবে। বাসার ছাদ থেকে লাফ দিতে হবে।

খাবার পর বড় আপু টেলিফোন বই থেকে তারেকের নাম্বার বের করে ফোন করে আম্মুকে ফোন ধরিয়ে দিল। আম্মু যখন কথা বলতে শুরু করেছেন তখন আমি ভাবলাম সরে পড়ি, কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। শুনলাম আম্মু বলছেন, "আমি ইবুর আম্মু, আপনি নিশ্চয়ই তারেকের আম্মু?"

ও পাশ থেকে তারেকের আম্মু কী বললেন আমি শুনতে পেলাম না, মনে হয় মায়েরা মায়েদের সাথে যে কথাগুলো বলে সেগুলো বলছেন, কারণ আম্মু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, একেবারে জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেছে। পাগল হয়ে যাবার

অবস্থা।" তারপর শুনলাম, আম্মু সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা করলেন, বললেন, "আচ্ছা আপা, ইবু বলছিল তারেকের ছোট চাচা নাকি বাচ্চাদের সাথে সুন্দরবন যাচ্ছেন?"

ঐ পাশ থেকে তারেকের আম্মু কী বলেছেন শুনতে পেলাম না, এই পাশে শুনতে পেলাম আম্মু বলছেন, "ও ছোট চাচা যাচ্ছেন না?"

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আম্মু এক্ষুণি টেলিফোনটা রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন, আমি তখন কী করব? একটা চাকু এনে বুকে বসিয়ে দেব? কিন্তু ঠিক তখন শুনলাম আম্মু বলছেন, "ছোট মামা যাচ্ছেন? তা হলে তো ভালোই।" ঐ পাশ থেকে তারেকের আম্মু কী বললেন শোনা গেল না কিন্তু শুনলাম আম্মু খুব হাসছেন। দুজনে আরো খানিকক্ষণ কথা বললেন, তারপর শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা রাখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারেকের আম্মু মানুষটি বেশ।"

বড় আপু জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ছেলের এত শখ সুন্দরবন যাবে—একা একা ছাড়তে সাহস পাচ্ছে না, তাই নিজের ভাইকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে ফেলেছে। টাকার কথা তো ছেড়েই দিলাম।"

আমি আম্মুর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম, আম্মু বললেন, "ঠিক আছে। তারেকের আম্মু যখন সব খোঁজখবর নিয়ে রেখেছেন তখন মনে হয় ট্রিপটা খারাপ হবে না। যা, ঘুরে আয়।"

আনন্দে চিৎকার করে আমার একটা লাফ দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমার সেরকম আনন্দ হল না, আম্মুর সাথে এরকম মিথ্যা কথা বলেছি সে জন্যে ভেতরটা কেমন জানি তেতো হয়ে আছে। মিথ্যা কথাটা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেছে—তারেকের ছোট চাচার বদলে তারেকের ছোট মামা—এইটুকুই শুধু ভুল, কিন্তু আসলে আমি যখন বলেছি তখন তো মিথ্যা জেনেই বলেছি! এর মাঝে আসলেই যে তারেকের আম্মু তারেকের ছোট মামাকে রাজি করিয়ে ফেলবেন আমি তো সেটা জানতাম না।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে আছি কিন্তু কেন জানি চোখে ঘুম আসছে না। আম্মুর সাথে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি—এখন সুন্দরবন যাবার পুরো আনন্দটাই কেমন যেন মাটি হয়ে গেল। সারাক্ষণই ভেতরে কেমন যেন খচখচ করতে থাকবে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি তখন আম্মু আমার ঘরে এলেন। ঘুমানোর সময় প্রতি রাতেই মশারি গুঁজে দেওয়া হয়েছে কিনা, লাইট নেভানো হয়েছে কিনা এই সব পরীক্ষা করে দেখেন। যখন আমার মশারি পরীক্ষা করে চলে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ আমি উঠে বসে বললাম, "আম্মু।"

আম্মু অবাক হয়ে বললেন, "সে কি ইবু! ঘুমাস নি?"

"না।"

"কী হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি?"

"না।"

"তা হলে?"

"আমার খুব খারাপ লাগছে আম্মু—" বলে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই আমি ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললাম।

আম্মু অবাক হয়ে মশারির ভেতরে ঢুকে বললেন, "কী হয়েছে বাবা? কী হয়েছে তোর?"

আমি একবারও ভাবি নি কেঁদে ফেলব—এত বড় একটা ধাড়ি ছেলে এরকম একটা জিনিস করতে গিয়ে কেঁদে ফেলব একবারও চিন্তা করি নি। কিন্তু একবার কাঁদা আরম্ভ করলে থামানো খুব কঠিন। আমি কাঁদতে কাঁদতেই পুরো বিষয়টা খুলে বললাম। আম্মুর সাথে মিথ্যা কথা বলার পর থেকে আমার ভেতরটা কেমন খচখচ করছে, অশান্তি লাগছে সেটাও বলে ফেললাম। সবকিছু শুনে আম্মু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ঠিক আছে এখন ঘুমা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ আম্মু?"

"না, ঠিক রাগ করি নাই—একটু মন খারাপ হয়েছে।"

"আম্মু—"

"কী হল।"

"দেখ—আমি জীবনে আর কোনোদিন তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলব না।"

"এত বড় প্রতিজ্ঞা করে ফেলিস না।"

"সত্যি আম্মু। তুমি দেখো—"

"যে কাজটা সবাইকে বলা যায় না সেই কাজ কখনো করতে নেই। তোদের বয়সে একটু-আধটু দুষ্টুমি করবি, মাঝে মাঝে ভুল করবি সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যখন ভুল করবি তখন যেন জানিস সেটা ভুল। একটা ভুল বা অন্যায় জিনিসকে কখনো সত্যি বলে বিশ্বাস করিস না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে আম্মু।"

"তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিই।"

"কী জিনিস?"

"যে কাজটা করে সেটা আমাকে বলতে পারবি না কখনো সেই কাজটা করবি না। বুঝে যাবি সেটা ভুল। আমি যদি বেঁচে নাও থাকি তা হলে নিজেকে জিজ্ঞেস করবি—এটা কি আম্মুকে বলতে পারব? যদি উত্তর হয় না—তার মানে কাজটা ঠিক না। সেই কাজটা কখনো করবি না। মনে থাকবে?"

"থাকবে আম্মু।" একটু থেমে বললাম, "এখন থেকে আর কখনো সেটা করব না। এখন থেকে কিন্তু—"

আম্মু একটু হাসলেন, বললেন, "তার মানে আগে কিছু করেছিস যেটা আমাকে বলা যাবে না?"

কিডন্যাপারের হাত থেকে উদ্ধার করার পুরো ঘটনাটার কথা আমার মনে পড়ল। আমি তাই দুর্বল ভাবে মাথা নাড়লাম। আম্মু অনেক দিন পর আমার মাথাটা বুকে চেপে একটু আদর করে দিয়ে বললেন, "যা এখন ঘুমা। বোকা ছেলে।"

আমি যখন ঘুমাতে গেলাম তখন আমার ভেতরে এতটুকু খচখচে ভাব নেই, নিজেকে মনে হচ্ছে আকাশের মেঘের মতো হালকা। বুকের ভেতরে বিশাল একটা শান্তি—আম্মুকে সবকিছু খুলে বলার মতো বুদ্ধিমানের কাজ আমি আমার জীবনে মনে হয় খুব বেশি করি নি!

যখন অন্য অনেক কিছুর সাথে আমরা আবিষ্কার করলাম তারেকের ছোট মামা হচ্ছেন একটা 'ইয়ে'—

আমি আর তারেক যাবার পারমিশন পেয়েছি, সাথে তারেকের ছোট মামা যাচ্ছেন শুনেই জয়ন্ত পারমিশন পেয়ে গেল। কাসেমের পারমিশনের জন্যে তারেকের আম্মুকে তার বাসায় একটু ফোন করতে হল। সবচেয়ে কঠিন হল কাজলের পারমিশন। তারেকের আম্মুর টেলিফোনে কাজ হল না, আমাদের সবার অনুরোধেও কাজ হল না—একদিন তারেকের আম্মু আর আমার আম্মুকে গিয়ে কাজলের আব্বু আর আম্মুকে অনেক কিছু বোঝাতে হল। শেষ পর্যন্ত কাজলও যেদিন পারমিশন পেল সেদিন আমাদের আনন্দ আর দেখে কে!

বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতি আমাদের একটা কাগজ পাঠিয়েছে, সেখানে কী কী নিতে হবে সেটা লেখা। সুন্দরবনে অনেক শীত পড়বে তাই বেশি করে গরম কাপড় নিতে হবে। রাত্রে ঘুমানোর জন্যে স্লিপিং ব্যাগ থাকলে নিতে বলেছে না থাকলে ছোট তোশক এবং কম্বল। স্লিপিং ব্যাগ জিনিসটা কী আগে কখনো দেখি নি, তারেক একটা দেখাল। মনে হল একটা লেপকে ভাঁজ করে সেলাই করে ব্যাগ বানিয়ে নিয়েছে! তারেকের স্লিপিং ব্যাগটার মতো আমরাও লেপকে সেলাই করে স্লিপিং ব্যাগ বানিয়ে নিলাম। অভিযাত্রী সমিতির লিস্ট দেখে আমরা কয়েকদিন আগে থেকেই আমাদের ব্যাকপেকের মাঝে জিনিসপত্র ভরতে শুরু করেছিলাম। কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট, সোয়েটার, মাফলার, মাথার টুপি, ছোট তোয়ালে, সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চা খাবার মগ, টর্চ লাইট, বাড়তি ব্যাটারি, ছোট একটা চাকু। একটা গেঞ্জি দিয়ে এক সপ্তাহ চালিয়ে দেওয়া যায়—আম্মুরা সেটা বোঝেন না, জোর করে এক গাদা গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, মোজা দিয়ে দিলেন! অনেক রকম তেল মালিশ করে বড় আপুর ক্যামেরাটা নিলাম, তারেকও একটা খুব ভালো ছোট ক্যামেরা নিল। জয়ন্ত কোথা থেকে জানি একটা বাইনোকুলার যোগাড় করে ফেলল। সুন্দরবন ভ্রমণের সময় আমাদের দুই বেলা খাবার, সকালে ব্রেকফাস্ট বিকেলে নাশতা দেবে, খাবার পানি দেবে—তারপরেও দেখি আম্মু এক গাদা খাবার জুস আর ড্রিংকস ধরিয়ে দিলেন। সবকিছু ব্যাকপেকের মাঝে ঢোকানোর পরে দেখি সেটা এত ভারী হয়েছে যে টেনে তোলা যায় না!

ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ বিকাল তিনটার সময় সবাইকে সদরঘাটে হাজির হতে বলেছে। তারেকের আম্মু একটা মাইক্রোবাস যোগাড় করবেন, আমরা সবাই তারেকের বাসায় হাজির হব, সেখান থেকে তারেকের ছোট মামা আমাদের সবাইকে সদরঘাট লঞ্চঘাটে নিয়ে যাবেন। আমি সকাল এগারোটা থেকে আম্মুর পিছনে লেগে গেলাম—পাছে না দেরি হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করে একটু খেয়ে আমি যখন আমার বোঝা নিয়ে তারেকদের বাসায় পৌঁছলাম তখন বারোটা বেজে পনের মিনিট। আমি সবার আগে চলে এসেছি, এখনো কেউ আসে নি।

তারেকের বাসায় গিয়ে তারেকের ছোট মামার সাথে দেখা হল। তারেকের আম্মু যেরকম হচ্ছেন একজন ফাটাফাটি মহিলা আমি ভেবেছিলাম সেরকম তারেকের ছোট মামাও

হবেন একজন ফাটাফাটি মানুষ। কিন্তু তার সাথে দেখা হবার একটু পরেই বুঝতে পারলাম মানুষটা বেশি সুবিধের না। কথাবার্তা কেমন জানি চালবাজের মতো। আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও! তুমিও সুন্দরবন যাচ্ছ? তোমার যে স্বাস্থ্য—তোমার তো রমনা পার্কেই যাওয়া ঠিক না।" তারপর হা হা করে হাসতে শুরু করলেন যেন খুব একটা রসিকতা করেছেন।

কিছুক্ষণের মাঝেই জয়ন্ত আর কাজলও চলে এল—এখন বাকি আছে শুধু কাসেম। আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে কিন্তু তবু আমি একটু অস্থির হয়ে ঘড়ি দেখতে লাগলাম। তারেকের ছোট মামা আমাদের দেখে কেমন জানি ঘ্যানঘ্যান করে বলতে লাগলেন, "এই আণ্ডা-বাচ্চাদের আমার এক সপ্তাহ দেখে রাখতে হবে?"

তারেকের আম্মু বললেন, "আণ্ডা-বাচ্চা হতে যাবে কেন? এরা বড় হয়েছে, তের-চৌদ্দ বছর বয়স হয়েছে।" ছোট মামা মুখ ভোঁতা করে বললেন, "তের-চৌদ্দ বছর বয়স হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ বয়স। ছোট বাচ্চাও না যে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাখবে আবার বড়ও হয় নি যে নিজেরা সবকিছু করবে।" ছোট মামা ঠোঁট উল্টে বললেন, "জঘন্য একটা সময়।"

আমাদের সামনেই বলছেন যে আমাদের বয়সটা হচ্ছে জঘন্য সময়। আমরা কিছু বললাম না, সহ্য করে গেলাম। কাসেম কেন আসছে না সেটা নিয়ে যখন আমরা চার জনই দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে দিলাম তখন সে হাজির হল। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসল—কাসেমের জন্যে সেটা বিশাল একটা ব্যাপার। ঘরের ভেতরে তারেকের ছোট মামা এমন ঘ্যানঘ্যান শুরু করলেন যে আমরা তখন রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মাঝে মাইক্রোবাসটা এসে গেল। আমরা তখন মহা উৎসাহে মাইক্রোবাসে আমাদের জিনিসপত্র তুলতে আরম্ভ করে দিলাম। তারেকের ছোট মামাও নিচে নেমে এসে উপদেশ দিতে শুরু করলেন, "আগে সবগুলি ব্যাকপেক—ওপরে বেডিংপত্র। ব্যাকপেক হচ্ছে ভারী—ভারী জিনিস থাকবে নিচে, স্ট্যাবিলিটি হবে বেশি। স্ট্যাবিলিটি হচ্ছে আসল কথা—"

আমরা যখন আমাদের ব্যাকপেক টেনে নিচ্ছি তখন ছোট মামা মুখ বাঁকা করে ফেললেন, "এই ব্যাকপেক নিতে গিয়েই কাহিল? এরকম দুর্বল মানুষ সুন্দরবনে অভিযান করতে যাবে?"

আমার এমন মেজাজ খারাপ হল যে বলার মতো না। আমরা সবাই যে দুর্বল না সেটা বোঝানোর জন্যে কাসেমকে বললাম, "কাসেম, আমাদের ব্যাকপেকগুলো তুলে দে দেখি।"

কাসেম হ্যাঁচকা টানে এক হাতে চারটা ব্যাকপেক মাইক্রোবাসে তুলে দিল। সেটা দেখে ছোট মামা মনে হয় একটু থতমত খেয়ে গেলেন। চোখের কোনা দিয়ে তখন কাসেমকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট একটা হিংসার ভাব দেখা যেতে আরম্ভ করল।

তারেকের আম্মু আমাদের সবাইকে অনেক উপদেশ দিয়ে মাইক্রোবাসে তুলে বিদায় দিলেন। সদরঘাটের রাস্তায় ভিড় হতে পারে ভেবে আমরা অনেক সময় নিয়ে রওনা দিয়েছি। আমাদের কপাল ভালো রাস্তায় সেরকম ভিড় নেই। ভিড় থাকলে দেরি হত সেটা একটা সমস্যা কিন্তু যেটুকু দেরি হত সেই সময়টুকু ছোট মামার আরো এক শ রকম বড়

বড় বোলচাল শুনতে হত সেটা আরো অনেক বড় সমস্যা। সারা রাস্তাটুকু ছোট মামা কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে গেলেন। ছোট মামার চরিত্রটুকু আমরা এতক্ষণে মাত্র আন্দাজ করতে শুরু করেছি, আসল রূপটা বুঝতে পারলাম জাহাজে উঠে। বিশাল জাহাজ, ওপরে লাল রঙের একটা পাল উড়ছে। নানা রকম রঙিন ঝালর দিয়ে জাহাজটাকে সাজানো হয়েছে। জাহাজের ঠিক ওঠার জায়গাতেই উজ্জ্বল কমলা রঙের টি-শার্ট পরা চশমা চোখে একজন হাসিখুশি মানুষ সবাইকে অভ্যর্থনা করছে। বুকের মাঝে একটা ব্যাজে নাম লেখা, সেটা দেখে বুঝতে পারলাম এই হাসিখুশি কমবয়সী মানুষটাই হচ্ছে কায়সুল ইসলাম জুয়েল। আমাদের পাঁচ জনকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাত তুলে বললেন, "তোমরাই নিশ্চয়ই সেই ঘর পালানো অ্যাডভেঞ্চারিস্ট!"

আমরা মুখে হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, জুয়েল ভাই বললেন, "এখান থেকে কিন্তু পালাতে পারবে না। যদি চেষ্টা কর তা হলে কিন্তু শেকল দিয়ে বেঁধে রাখব।"

জয়ন্ত বলল, "আমরা পালাব না।"

"কথা দিলে তো আমাকে?"

আমরা বললাম, "কথা দিলাম।"

"মনে থাকবে তো?"

"মনে থাকবে, জুয়েল ভাই।"

জুয়েল ভাই বললেন, "ভেরি গুড। আমি খুব খুশি হয়েছি যে তোমরা আসতে পেরেছ। দেখো কত মজা হবে সবাই মিলে।"

ছোট মামাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে ততক্ষণে তিনি খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। মুখ ভোঁতা করে বললেন, "আমাদের জন্যে থাকার ব্যবস্থা কী করা হয়েছে?"

জুয়েল ভাই বললেন, "সবার জন্যে ডেকে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

ছোট মামা আঁতকে উঠে বললেন, "ডেকে?"

"হ্যাঁ। সবাই ডেকে থাকবে।"

ছোট মামা চোখ পাকিয়ে বললেন, "একজন ভদ্রলোক জাহাজের ডেকে কেমন করে থাকবে? কেবিন নাই?"

"কয়েকটা কেবিন আছে। কিন্তু আমরা সেগুলো আমাদের আসল গেস্টদের জন্যে রেখেছি।" জুয়েল ভাই ছোট মামাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, "আমাদের সাথে কয়েকজন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-গায়ক যাচ্ছেন—"

ছোট মামা বললেন, "আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?"

জুয়েল ভাই অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না-না-ছিঃ! এটা কী বলছেন, আপনি বানের জলে ভেসে আসবেন কেন? কিন্তু গোড়া থেকেই তো সেরকম ঠিক করা আছে—সবাই ডেকে ঘুমাবে। আমাদের ফ্লায়ারেও আমরা সেটা বলেছি। আমরাও ডেকে ঘুমাব! আমাদের কিছু গেস্ট একটু বয়স্ক তাই তাদের জন্যে কেবিন—"

ছোট মামা বললেন, "আমি ডেকে শুয়ে যেতে পারব না। আমি যাবই না। এই তারেক চল—"

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন কী হবে? ছোট মামা যদি রাগ করে চলে যান আমরা তা হলে কেমন করে যাব?

ছোট মামা রেগেমেগে বললেন, "কখনো শুনেছেন একটা ভদ্রলোকের ফ্যামিলি ডেকে শুয়ে যাচ্ছে? শুনেছেন?"

জুয়েল ভাই মানুষটার মাথা খুব ঠাণ্ডা। মুখে হাসি ধরে রেখে বললেন, "আসলে আমরা তো প্রতিবছরই অ্যারেঞ্জ করি, প্রতিবছরই সবাই ডেকে শুয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, ছোট ছোট কেবিনে চাপাচাপি করে থাকার চেয়ে ডেকে থাকা অনেক মজার।"

ছোট মামা বললেন, "নেভার। আমি যাবই না। আমার টাকা ফেরত দেন। আমি চলে যাব। সবাইকে নিয়ে চলে যাব।"

তারেক দুর্বল গলায় বলল, "ছোট মামা। আমাডের ডেকে ঠাকটে কোনো অসুবিডা হবে না।"

ছোট মামা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তোদের অসুবিধা না হতে পারে কিন্তু আমার অসুবিধা হবে। আয় সবাই, চলে যাই—"

জুয়েল ভাই তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা মেয়েকে ডাকলেন, দুজনে মিলে কী যেন কথা বললেন তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে আপনাকে একটা কেবিন দিচ্ছি—এই বাচ্চাদের কিন্তু ডেকেই থাকতে হবে।"

আমরা পাঁচ জন একসাথে বললাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমরা ডেকেই থাকব।"

জুয়েল ভাই তখন আমাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। আমরা আমাদের লট বহর নিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম, সেখানে বিশাল ডেক, তার মাঝে সবাই নিজেদের বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছে। এখনো খুব বেশি মানুষ আসে নি—তাই ভালো ভালো জায়গাগুলো দখল হয় নি। আমরা ডেকের মাঝামাঝি রেলিঙের পাশে একটা চমৎকার জায়গা বেছে নিয়ে আমাদের বিছানা পেতে ফেললাম। ছোট মামা নিজের ব্যাগ-বেডিং নিয়ে তার কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

আমরা রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছি, পাশাপাশি অনেকগুলো বড় বড় লঞ্চ আর জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, মানুষজনের ভিড়, মালপত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে এদিক-সেদিক যাচ্ছে। নৌকা করে মানুষজন লঞ্চের কাছে আসছে, জিনিসপত্র ওঠাচ্ছে এবং নামাচ্ছে, সব মিলিয়ে বিশাল হইচই। জাহাজের উপর থেকে ব্যস্ত এই মানুষগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে।

দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজটাও ভরে উঠতে লাগল। ছেলেমেয়ে নিয়ে ফ্যামিলিরা উঠে আসতে লাগল, আমাদের চারপাশে বিছানা পেতে সবাই মিলে হইচই করতে লাগল। জুয়েল ভাই মনে হয় ঠিকই বলেছেন, আগামী সাত দিন যা মজা হবে সেটা আর বলার মতো নয়। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম দুজন বিদেশী মানুষও এসেছে—ছোট মামা কেবিনের জন্যে এত চেঁচামেচি করেছেন কিন্তু এই বিদেশীগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই ডেকে স্লিপিং ব্যাগ পেতে শুয়ে আছে! তারা নিশ্চয়ই কেবিনের জন্যে ঝগড়াঝাঁটি করে নি।

আমরা যদিও সেই তিনটার আগে থেকে এসে বসে আছি কিন্তু আমাদের জাহাজটা ছাড়ল বিকেল পাঁচটার সময়। শীতের বিকেল, চারদিকে কেমন নরম একটা আলো। জাহাজটা ছাড়ার সময় আমরা জাহাজের ছাদে এসে ভিড় করলাম। সেখানে বসার খুব সুন্দর জায়গা আছে, আমরা গাদাগাদি করে বসে পড়লাম। জাহাজটা সাজিয়েছে খুব সুন্দর

করে, তীর থেকে যারাই দেখছে তারাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। নদীর কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিছুক্ষণের মাঝেই নিচে চলে যেতে হল। আমরা জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম—ইঞ্জিনঘরটা দেখতে সবচেয়ে দারুণ। ভয়ঙ্কর শব্দ করে ইঞ্জিন চলছে, যা গরম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, কিন্তু তার মাঝে কালিঝুলি মেখে দুজন মানুষ কাজ করছে। আমরা হেঁটে হেঁটে পিছনে গেলাম, পানি কেটে কেটে জাহাজটা ছুটে যাচ্ছে, পানির ঢেউ আর ফেনা, কেউ একজন এখানে পড়ে গেলে একমুহূর্তে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে! জাহাজের সামনের দিকে এক জায়গায় কমবয়সী অনেকগুলো ছেলেমেয়ে বসে গল্প করছে। তার মাঝে জুয়েল ভাইও আছেন, আমাদের দেখে বললেন, "অ্যাডভেঞ্চার পার্টি—কেমন লাগছে?"

আমি বললাম, "খুব ভালো।"

"ভালোর এখন কী দেখলে—আগে সুন্দরবনে ঢুকে নিই তখন দেখবে কী মজা!"

নদীর বাতাসের নিশ্চয়ই কিছু একটা গুণ আছে। সন্ধে সাতটার সময়েই আমাদের পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করতে লাগল। কাসেম নিচে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসে বলল, রান্না শেষের দিকে, একটু পরেই খাবার দিবে। কাসেমের কথা সত্যি—একটু পরেই খাবারের ডাক পড়ল। আমরা তখন দৌড়াদৌড়ি করে নিচে গেলাম। বিশাল ডেকচিতে রান্না হয়েছে, সেগুলো পাশাপাশি সাজানো। সবাই থালা হাতে নিয়ে যাচ্ছে, অভিযাত্রী সমিতির ভলান্টিয়াররা তাদের থালায় ভাত তরকারি ডাল তুলে দিচ্ছে। আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট মামাকে খুঁজছি কিন্তু তিনি কোথাও নেই। তাকে নিয়ে একসাথে খাওয়া উচিত ছিল কিনা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু পেটে যা খিদে লেগেছে যে তার জন্যে আর অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই।

আমরা যখন লাইন দিয়ে আস্তে আস্তে সামনে যাচ্ছি তখন ছোট মামাকে দেখলাম বিখ্যাত কবি জাকারিয়া শামসের সাথে নিচে নেমে আসছেন। পত্রিকায় অনেকবার কবি জাকারিয়া শামসের ছবি দেখেছি, ছবি দেখে তাকে অনেক বড় মনে হত, সামনাসামনি দেখি মানুষটা ছোটখাটো। তার সাথে বিখ্যাত লেখক আবু শাহরিয়ার আর গায়ক জামাল উদ্দিন। তাদের সাথে আরো কয়েকজন বয়স্ক মানুষ—এরা সবাই নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত আর ইম্পরট্যান্ট কারণ সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে তাদেরকে একেবারে লাইনের সামনে নিয়ে গিয়ে সবার আগে প্লেটে খাবার তুলে দিল। বিখ্যাত মানুষদের সাথে সাথে ছোট মামাও বিখ্যাত মানুষদের মতো ভাব করতে লাগলেন, তার প্লেটেও খাবার তুলে দেওয়া হল। ছোট মামা সেটা নিয়ে বিখ্যাত মানুষদের সাথে খেতে বসে গেলেন! আমরা খেয়েছি কি না সেটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই!

কাজল বলল, "দেখলি তারেক, তোর মামার কারবারটা দেখলি! আমাদের কোনো খোঁজ না নিয়ে একা একা খেতে বসে গেল!"

তারেক দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা শব্দ করল, যেটা মনে হল একটা ইংরেজি গালি, তারপর বলল, "আমার এই মামাটা সবচেয়ে সেলফিস আর সবচেয়ে ইউজলেস!"

জয়ন্ত বলল, "সেইটাই ভালো, বিখ্যাত লোকদের পিছনে পিছনে ঘুরবেন, আমাদের বিরক্ত করবেন না!'

কাসেম নাক দিয়ে শব্দ করে বলল, "ঘ্রোঁত ঘ্রোঁত।"

আমরা লাইন ধরে খাবারের কাছে পৌঁছলাম, একজন প্লেটে এক গাদা ভাত তুলে দিল, একজন সবজি, আরেকজন মুরগির মাংস। আরেকজন ছোট বাটিতে এক বাটি ডাল ধরিয়ে দিল। আমাদেরকে যত খাবার দিয়েছে আমরা দুইদিনেও সেটা খেয়ে শেষ করতে পারব না।

আমরা খাবার টেবিলে গোল হয়ে বসে খেতে শুরু করলাম—বাসায় এই খাবার দেওয়া হলে অন্তত দশবার আম্মুর সাথে ঘ্যানঘ্যান করতাম—কিন্তু আজকে ঘ্যানঘ্যান না করে গপাগপ করে খেতে থাকি। সত্যি কথা বলতে কি স্বাদটা মনে হল অপূর্ব। ভেবেছিলাম অল্প একটু খেতে পারব—কিন্তু আমরা অর্ধেক প্লেট খেয়ে ফেললাম। কাসেমের কথা অবিশ্যি আলাদা, সে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার তার প্লেটটা চূড়ার মতো ভর্তি করে ভাত ডাল সবজি নিয়ে এল—তার পেটের ভেতরে কোথায় এত জায়গা কে জানে!

খেয়েদেয়ে আমরা ছাদে উঠে গেলাম, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, মাথায় উলের টুপি, মাফলার দিয়ে নাক-মুখ-গলা পেঁচিয়ে রেখেছি, গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার—শীতের বাবার সাধ্যি নাই শরীরে ঢোকে। খাবার পরে অনেকে ছাদে এসেছে। একটা টেবিল ঘিরে ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্রছাত্রী গান গাইছে। বেশিরভাগই বেসুরো—কিন্তু একজন দুইজনের গানের গলা এত সুন্দর যে বলার মতো নয়। একজন টেবিলটাকে তবলা বানিয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হবে—এটা টেবিল না, এটা আসলেই তবলা আর বায়া।

ছাদে বাতি নিভিয়ে রেখেছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে সেই জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে। চারদিকে সুনসান অন্ধকার, তার মাঝে শুধু পানি আর পানি দেখে কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে থাকে। বহুদূরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে, মনে হয় সেগুলো বুঝি অন্য কোনো জগতের আলো। পানিতে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে একটা দুটো নৌকা, আমাদের বিশাল জাহাজ ঢেউ তুলে যাবার পর নৌকাগুলো দুলতে থাকে! কী বিচিত্র আর আশ্চর্য মনে হয় আমাদের কাছে। আমরা যখন বাসায় থাকি তখন প্রত্যেক দিন আমরা একইভাবে থাকি, একই কাজ করি, তার তুলনায় এটা এত অন্যরকম ভিন্ন একটা রাত যে আমরা কেমন যেন হতবাক হয়ে বসে থাকি।

কাসেম একসময় তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "রাত হয়েছে।"

আমরা ঘড়ির দিকে তাকালাম, রাত এগারটা বাজে—এমন কিছু রাত হয় নি কিন্তু কাসেম নিশ্চয়ই বেশি রাত করে না। কে জানে বেশি রাত করে ঘুমালে মনে হয় মানুষের এরকম পাথরের মতো শরীর তৈরি করা যায় না। ঘুমানোর আগে মনে হয় ছোট মামার সাথে একবার দেখা করা দরকার—আমরা তাই তাকে খোঁজ করতে লাগলাম।

ছাদের এক কোনায় তাকে পাওয়া গেল, বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সাথে বসে আছেন, সবাই বড় বড় জিনিস নিয়ে কথা বলছে আর ছোট মামা সবকিছু বুঝে ফেলছেন সেরকম ভান করে মাথা নাড়ছেন! আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোট মামা আমাদের দেখেও না দেখার ভান করে বড় বড় জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন! আমরা কী আর করি, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। কাজল ফিসফিস করে তারেককে বলল, "তোর মামার মাঝে একটা চামচা চামচা ভাব আছে!"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ! দেখছিস বড় বড় বিখ্যাত মানুষদের পাশে বসে কেমন তেল দিচ্ছে!"

আমি বললাম, "তোর আম্মু এত ভালো, তোর মামা এরকম চামচা হল কেমন করে?"

কাসেম বলল, "চামচা গুণ বড় গুণ। এই দেশে অনেক কাজে লাগে।"

তারেক একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আই এ্যাম সরি।"

আমি বললাম, "তোর সরি হওয়ার কী আছে! তোর মামা রাজি হয়েছেন বলেই তো আমরা আসতে পেরেছি। তা না হলে কি আসতে পারতাম?"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক। তা ঠিক!" পুরো ব্যাপারটা মনে হওয়া মাত্র আমরা সবাই ছোট মামার সব চামচাগিরি এক কথায় মাপ করে দিলাম।

ঘুমানোর সময় আমরা সব জামাকাপড় সোয়েটার মাফলার পরে আমাদের স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেলাম। লেপ সেলাই করে আমরা নিজেরাই স্লিপিং ব্যাগ তৈরি করে ফেলেছি কিন্তু মনে হচ্ছে আসল স্লিপিং ব্যাগ থেকে ভালো হয়েছে। আমরা গুটিসুটি মেরে ভিতরে শুয়েছি। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা কিন্তু ভিতরে কী আরাম-আরাম উসুম-কুসুম গরম! আমরা নিচুগলায় কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝতে পারি না কোথায় আছি। গুমগুম একটা চাপা শব্দ, তার মাঝে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছি। হঠাৎ করে মনে পড়ল আমরা সুন্দরবনে যাচ্ছি—আমি স্লিপিং ব্যাগ থেকে মাথা বের করলাম। রেলিঙের কাছে স্লিপিং ব্যাগ মুড়ি দিয়ে কে যেন বসে আছে, আমি উঠে বসে দেখি জয়ন্ত। জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "কী সুন্দর দেখেছিস?"

আমি বাইরে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম, সত্যিই অপূর্ব। মাত্র সকাল হতে শুরু করেছে, এখনো সূর্য ওঠে নি, ভোরের কুয়াশায় খুব পাতলা চাদরের মতো ঝুলে আছে। তার ভেতর দিয়ে নদীর দুই পাশে গাছগাছালি ধানক্ষেত আর গ্রামকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। ঢাকা শহরে থেকে থেকে আমাদের চোখ নিশ্চয়ই পচে গেছে। আমাদের দেশে এত সুন্দর দৃশ্য আছে কিন্তু আমরা আগে কোনোদিন দেখি নি। আমি আর জয়ন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সুন্দর একটা দৃশ্য দেখার জন্যে সুন্দর একটা পরিবেশও দরকার, আমার মনে হয় যে, এরকম সুন্দর পরিবেশও আগে কখনো হয় নি!

একটু পর তারেক আর কাজলও উঠে আমাদের পাশে বসেছে। তারাও রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। ভাবলাম কাসেমকেও তুলে দিই। তুলতে গিয়ে দেখি তার স্লিপিং ব্যাগ ফাঁকা—সে আগেই উঠে গেছে। উঠে কোথায় গেছে কে জানে। জয়ন্ত বলল, "নিশ্চয়ই ব্যায়াম করছে।"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, কাসেম প্রত্যেকদিন সকালে এক ঘণ্টা ব্যায়াম করে।"

আমরা বিছানা থেকে উঠে কাসেমকে খুঁজতে বের হলাম, উপরে উঠে দেখি আমাদের ধারণা সত্যি। এই শীতের মাঝে ছোট একটা হাফপ্যান্ট আর পাতলা জিলজিলে একটা গেঞ্জি পরে কাসেম একটার পর একটা বুকডন দিচ্ছে। উপরে কেউ নেই, কুয়াশায় সবকিছু ভিজে রয়েছে। আমাদের দেখে কাসেম মনে হয় একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বুকডন থামিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "প্রত্যেকদিন ব্যায়াম না করলে শরীরে জুত পাই না।"

আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "তোর ঠাণ্ডা লাগে না?"

কাসেম একটা তোয়ালে দিয়ে শরীরের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "ব্যায়াম করলে শরীর গরম হয়ে যায়।"

আমরা লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়ে নদীর তীরে তাকিয়ে রইলাম, নদীর দুই পাশে গ্রামগুলো আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে সেটি বলার মতো নয়। মাঝে মাঝে ক্যালেন্ডারে এরকম ছবি দেখা যায় কিন্তু সেগুলো যত সুন্দরই হোক ছবি—এটি সত্যি। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

তারেক বলল, "আমার আম্মু সব সময় বলটো বাংলাডেশ সুন্ডর। আমি এসে কোঠাও কোনো সুন্ডর জিনিস ডেখি নাই। এখন বুঝটে পারছি—"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝতে পারছিস?"

"বাংলাডেশ আসলেই সুন্ডর।"

আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, আস্তে আস্তে জাহাজের ছাদে আরো মানুষেরা উঠে আসতে লাগল। একসময় দেখলাম কবি জাকারিয়া শামস বের হয়ে এসেছেন। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে তিনি ছাদে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলতে লাগলেন—কবি মানুষেরা নিশ্চয়ই একটু পাগলা ধরনের হয়। কবি জাকারিয়া শামস হাঁটতে হাঁটতে নিজের কেবিনের কাছে গিয়ে ডাকলেন, "নূরু—নূরু—"

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, কেবিনের ভিতর থেকে ছোট মামা বের হয়ে এলেন, তার চোখের নিচে কালি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্কখুস্ক। আমি অবাক হয়ে তারেককে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর ছোট মামার নাম নূরু?"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল "উঁহ্। নূরুল।"

"তা হলে নূরু করে ডাকছেন কেন? নূরু তো মেয়েদের নাম।"

জয়ন্ত বলল, "মনে হয় আদর করে ডাকছেন। বেশি চামচাগিরি করেছেন তো সেই জন্যে।"

আমরা দেখলাম ছোট মামা ঘুমঘুম চোখে জবুথবু অবস্থায় কবি জাকারিয়া শামসের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "জাকারিয়া ভাই, আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। কী এখনো ঘুমাচ্ছ। তাকিয়ে দেখ প্রকৃতি কত সুন্দর। সৌন্দর্যের ডালা মেলে দিয়েছে।"

ছোট মামা চোখ পিটপিট করে সৌন্দর্যের ডালা মেলে দেওয়া প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেটা উপভোগ করলেন বলে মনে হল না। তবে প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

কবি জাকারিয়া শামস মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এই কাকভোরে কুয়াশার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখতে হলে আরো একটি জিনিসের দরকার। সেটা কী, বল দেখি নূরু।"

ছোট মামা বোকার মতো মাথা নাড়লেন, বললেন, "জানি না।"

"সেটা হচ্ছে চা।" কবি জাকারিয়া শামস চোখ বড় বড় করে বললেন, "যাও দেখি নূরু—আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে এস। গরম চা।"

ছোট মামা কেমন যেন মিইয়ে গেলেন, বললেন, "এত সকালে কি চা রেডি হয়েছে?"

কবি জাকারিয়া শামস ধমক দিয়ে বললেন, "রেডি না হলে রেডি করবে। আমার জন্যে চা বানানোর মতো সহজ একটা কাজ করতে পারবে না?"

ধমক খেয়ে ছোট মামা কেমন যেন আরো মিইয়ে গেলেন। আমাদের সামনে এভাবে ধমক খেয়ে মনে হয় একটু লজ্জাও পেয়ে গেলেন, আর কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি চা আনতে চলে গেলেন। কবি জাকারিয়া শামস তখন হাঁটতে হাঁটতে আমাদের কাছে এসে বললেন, "কী খোকারা? তোমরা কী করছ?"

আমি তাড়াতাড়ি নদীর তীরে তাকিয়ে গ্রামগুলো দেখছি ভান করে বললাম, "দেখছি!"

কবি জাকারিয়া শামস হা হা করে হেসে বললেন, "দেখছ? আমাকে দেখার কী আছে? আগে কখনো কবি দেখ নাই?"

এই মানুষটা হয়তো ভালো কবিতা লিখতে পারে কিন্তু তার খুব মাথামোটা! তার ধারণা পৃথিবীর সব মানুষ তাকে তোয়াজ করে। আমি কখনো বলি নি আমরা তাকে দেখছি, কিন্তু তিনি ধরেই নিলেন আমরা তাকে দেখছি! আমাদের সবাইকে একনজর দেখে কবি জাকারিয়া শামস বললেন, "আমি তো এখানে পুরো এক সপ্তাহ আছি— এই কাকভোরে উঠে শীতের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে হবে?"

আমরা কিছু না বলে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কবি জাকারিয়া শামস মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "অটোগ্রাফ লাগবে? দাও কাগজ-কলম।"

জয়ন্ত বলল, "কাগজ-কলম তো আনি নি—"

"তা হলে অটোগ্রাফ নিবে কেমন করে? ঠিক আছে, পরে নিয়ে এসো। সবাইকে আলাদা আলাদা অটোগ্রাফ দিয়ে দেব।" কবি জাকারিয়া শামস মুখে একটা ভেজা ভেজা হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমরা আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নিচে চলে এলাম।

আমরা যখন দাঁত ব্রাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়েছি তখন নিচে ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়ল। আবার সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে, একজন একজন করে নাশতা তুলে নিচ্ছে। দুই স্লাইস রুটি, মাখন এবং জেলি, একটা সিদ্ধ ডিম এবং একটা কলা; তার সাথে এক কাপ চা। কাসেম ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "এত কম নাশতা?"

আমি বললাম, "আমি এত খেতে পারব না। আমারটা তুই খেয়ে নিস।"

জয়ন্ত বলল, "আমারটাও।"

তারেক আর কাজলও বলল, "আমারটাও।"

কাজেই আমাদের নাশতার অল্প কিছু আমরা খেলাম, বাকিটা কাসেম শেষ করে দিল।

বেলা দশটার দিকে মাইকে এনাউন্স করে সকল অভিযাত্রীকে ছাদে যেতে বলা হল। গিয়ে দেখি সেখানে একটা সুন্দর স্টেজের মতো তৈরি করা হয়েছে। সেখানে মাইক্রোফোন স্পিকার এই সব রাখা হয়েছে। মাইক্রোফোন হাতে জুয়েল ভাই সবাইকে বসতে বলে কথা বলতে শুরু করলেন। জুয়েল ভাই খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। কথা শুনে মনে হয় বুঝি টেলিভিশনের কোনো মানুষ কথা বলছে। আমাকে যদি কেউ মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলতে দেয় আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারব বলে মনে হয় না।

জুয়েল ভাই বললেন, "আমরা আমাদের অভিযান শুরু করে দিয়েছি—আজ রাতের মাঝে আমরা সুন্দরবনে পৌঁছে যাব। কাল যখন রাত ভোর হবে আপনারা অবাক হয়ে দেখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুন্দর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। কিন্তু এই সুন্দর

জায়গায় যাওয়ার আগে আমাদের সবার সাথে সবার পরিচয় করে নেওয়া দরকার। আমি নিজেকে দিয়ে শুরু করি, আমার নাম কায়সুল ইসলাম জুয়েল। আপনারা সবাই যেন এই অভিযানটি উপভোগ করতে পারেন সেই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার। তবে আগে থেকে বলে রাখি আমাদের ভেতর অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি হবে, মনে রাখবেন সেই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিই কিন্তু এই অভিযানকে স্মৃতির সাথে পাকাপাকিভাবে গেঁথে দেবে! আমি নিশ্চিত, আমরা সবাই এই অভিযানটি উপভোগ করব—কারণ এখানে সারা বাংলাদেশ থেকে চমৎকার সব মানুষ এসে জড়ো হয়েছেন। এখন একজন একজন করে এই মঞ্চে আসুন, নিজের পরিচয় দিন, দু-একটা কথা বলুন অন্য সবাইকে উদ্দেশ করে!"

তারপর একজন একজন করে মঞ্চে গিয়ে নিজের নাম বলতে লাগল। শীতের সকালে রোদটি খুব মজার, জাহাজটি যাচ্ছে বড় একটা নদীর ভেতর দিয়ে—নদীর দুই পাশে বন-জঙ্গল, গ্রাম, ক্ষেত। আমাদের স্কুলে যেতে হবে না, হোমওয়ার্ক করতে হবে না, আব্বু-আম্মুর বকুনি খাওয়ার ভয় নেই, এক সপ্তাহ সুন্দরবনে ঘুরে বেড়াব—সবার মনেই এক ধরনের ফুরফুরে আনন্দ। একেকজন যখন কথা বলছিল তাদের সেই কথার মাঝ দিয়েই সেই আনন্দটা বের হয়ে আসছিল।

কাসেম আমাকে গুঁতো দিয়ে বলল, "আমাকেও কিছু বলতে হবে নাকি?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ। সবাইকে বলতে হবে দেখছিস না?"

কাসেম বলল, "আমি পারব না।"

আমি বললাম, "আমিও পারব না।"

কাজল বলল, "আমিও পারব না। এত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলে কাপড়ে পিশাব হয়ে যাবে।"

জয়ন্ত চোখ পাকিয়ে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাজে কথা বলিস না।"

"বাজে কথা না। সত্যি কথা।"

আমি তারেককে গুঁতো দিয়ে বললাম, "তুই বলতে পারবি?"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "পারব।"

জয়ন্ত বলল, "তা হলে তুই আমাদের পাঁচ জনের হয়ে বলে দিস।"

একজন একজন করে মঞ্চে এসে নিজের কথা বলছে। কেউ ফেমিলি নিয়ে এসেছে, ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। কেউ এসেছে একা। বিদেশী দুজন কী বলল কেউই ভালো করে বুঝতে পারলাম না, শুধু তারেক সবকিছু বুঝে ফেলেছে এরকম ভান করে মাথা নাড়ল। কবি জাকারিয়া শামস মঞ্চে উঠে কথা বলতে শুরু করে আর থামতে চান না। বিখ্যাত কবি—তাই কেউ কিছু মনে করল না। লেখক আবু শাহরিয়ার আবার উল্টো, কথাই বলতে চান না। তিনি কী রকম ব্যস্ত মানুষ, এখানে আসার জন্যে তার কী রকম কষ্ট করে সময় বের করতে হয়েছে, তিনি কত কাজ ফেলে এসেছেন এসব নিয়ে তিনি একটু ধানাইপানাই করলেন। গায়ক জামাল উদ্দিন আরো এক ডিগ্রি সরেস—তিনি মঞ্চে উঠে নিজের নামটা পর্যন্ত বলতে চান না। মানুষ যখন বিখ্যাত হয় তখন মনে হয় অহঙ্কারে তাদের মাটিতে পা পর্যন্ত পড়ে না।

একজন একজন করে যখন আমাদের পালা এল তখন জুয়েল ভাই হঠাৎ মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বললেন, "এখন আপনাদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই

একটি বিশেষ দলকে! এরা সবাই ক্লাস এইটের ছাত্র—এদের জীবনে কোনো উত্তেজনা ছিল না— অ্যাডভেঞ্চার ছিল না বলে এরা অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বাসা থেকে পালিয়েছিল। আমরা তাদের পাঁচ জনকে বিশেষ গেস্ট হিসেবে এনেছি।" জুয়েল ভাই হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন, "না। না। আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যওয়াকে উৎসাহ দিচ্ছি না। কিন্তু কমবয়সী ছেলেমেয়ে কিশোর-কিশোরীর জীবনে দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের বাইরে খানিকটা আনন্দ দেওয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছি!" জুয়েল ভাই তখন হাত তুলে বললেন, "অ্যাডভেঞ্চার গ্রুপ!"

আমরা পাঁচ জন তখন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম, কী কারণ জানি না তখন সবাই জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল। তারেক মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বলল, "আমি খুব ভালো বাংলা বলটে পারি না, টাই প্লিজ আমার কঠা শুনে আপনারা হাসবেন না!"

তারেকের এই কথা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে লাগল, হাসি এমন একটা ছোঁয়াচে জিনিস যে আমরাও হাসতে শুরু করলাম।

সামনে বসে থাকা একজন তারেকের মতো উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, "টুমি কেন বাংলা বলটে পার না?"

তারেক বলল, "আমি এই ডেশে নূটন এসেছি, টাই।"

আবার সবাই হাসিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তারেক হাসিটা থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল, জয়ন্তকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "এর নাম জয়ন্ট।" (আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়ে বললাম, "জয়ন্ট মানে হচ্ছে জয়ন্ত।" সবাই তখন আবার হি হি করে হেসে উঠল।) তারেক মাইক্রোফোনটা আবার নিজের কাছে নিয়ে বলল, "জয়ন্ট হচ্ছে বড় কবি। সে খুব ভালো কবিটা লিখটে পারে।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, "এর নাম ইবু। ইবু হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিস্ট। সে সব সময় সায়েন্টিফিক গবেষণা করে।"

আমি দেখলাম কাজল একটু ভয়ে ভয়ে তারেকের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের মাঝে কাজল খবিশ হিসেবে বিখ্যাত, এখন যদি তাকে সবার সামনে খবিশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় তখন কী হবে? তারেক অবিশ্যি সেটা করল না, কাজলকে দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে কাজল। কাজল হচ্ছে আমাডের ব্রেন। আমাডের যখন কোনো সমস্যা হয় টখন কাজল টার সমাডান বের করে ডেয়!" আমি দেখলাম তারেকের কথা শুনে কাজলের মুখের হাসি এই গাল থেকে ওই গাল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল বুকটাও দুই ইঞ্চি ফুলে গেল।

তারেক তখন কাসেমকে দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে আমাডের বিখ্যাট কাসেম। আপনাডের সবার গায়ে যট জোর আমাডের কাসেমের গায়ে টার ঠেকে বেশি জোর।" তারেকের কথা শুনে সবাই কেন জানি আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সামনে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসে ছিল তারা চিৎকার করে স্লোগানের মতো করে বলতে লাগল, "দেখতে চাই! দেখতে চাই!! দেখতে চাই!!!"

আমি কাসেমকে বললাম, "কাসেম, দেখা।"

কাসেম চোখ-মুখ লাল করে বলল, "কী দেখাব?"

"তোর হাতের মাসল দেখা।"

কাসেম ফ্যাকাসে হয়ে বলল, "দূর!"

আমরা তার শার্টের হাতা গুটিয়ে তার হাতের মাসল দেখানোর চেষ্টা করলাম, সে আমাদের একটা ঝটকা মারল—আমরা সবাই তিন দিকে ছিটকে পড়লাম! তাই দেখে সবাই হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়ে হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, "দেখেছি! দেখেছি!! দেখেছি!!!"

সবার পরিচয় শেষ করে দিয়ে তারেক নিজেকে দেখিয়ে বলল, "আর আমি হচ্ছি টারেক।" (আমি মাইক্রোফোনটা টেনে নিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়ে বললাম, টারেক মানে তারেক।) তারেক বলল, "হ্যাঁ টারেক। আমি ওডের সবার বড়ু।"

সবাই জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। তার মাঝে আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে আসছি তখন ছোট মামার চোখে চোখ পড়ল—তার মুখটা শুকনো এবং বিমর্ষ। আমাদেরকে চেনেন সেরকম ভানটি পর্যন্ত করেন নি কিন্তু সবাই এভাবে আমাদের হাততালি দিচ্ছে—ব্যাপারটা মনে হয় তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। তারেকের ছোট মামার যখন কথা বলার সময় হল তখন দাঁড়িয়ে নিজের নাম বলে বললেন, "আমি এই পাঁচজন ঘর পালানো ছেলের গার্জিয়ান হয়ে এসেছি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আমাদেরকে সবাই পছন্দ করেছে বলে ছোট মামাকেও সবাই পছন্দ করছে। সেটা দেখে ছোট মামা মনে হল আরো বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

সবার সাথে পরিচয় করার পর একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা সুন্দরবন সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। বনটি কীভাবে তৈরি হয়েছে, কীভাবে বড় হচ্ছে বুঝিয়ে দিলেন। সুন্দরবনে কী কী গাছ আছে তার একটা বর্ণনা দিলেন। সুন্দরবনে কী কী পশুপাখি আছে সেগুলো বললেন। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সময় কথা বললেন। এই বাঘ সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণা আছে, সেগুলো ভাঙিয়ে দিলেন। বাঘ সম্পর্কে কী কী ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় সেসব বুঝিয়ে দিলেন। এই ভদ্রমহিলার কাছেই প্রথম জানতে পারলাম স্থানীয় অনেক মানুষ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে মামা বলে ডাকে!

ভদ্রমহিলার কথা বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, যতক্ষণ কথা বলছিলেন সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনল—দীর্ঘদিন থেকে এই এলাকায় আছেন, ক্যামেরা নিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি তোলেন, হরিণের বাচ্চাকে বোতল দিয়ে দুধ খাইয়ে বড় করেন, কাজেই সুন্দরবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তার মতো ভালো করে কেউ জানে না। সুন্দরবন নিয়ে যার যা প্রশ্ন ছিল ভদ্রমহিলা তার সবগুলোর উত্তর দিলেন!

ভদ্রমহিলার আলোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দুপুরের খাবারের ঘণ্টা বেজে উঠল, আমরা সবাই তখন আবার খেতে ছুটলাম। ঠিক কী কারণ জানি না, মনে হয় নদীর স্বাস্থ্যকর বাতাসের জন্যেই হবে—আজকাল খুব খিদে পায়, খেতে বসে মনে হয় দুই গামলা ভাত খেয়ে ফেলব। আমরা আজকে যখন লাইনে দাঁড়িয়েছি তখন সবাই আমাদের সাথে কথা বলতে লাগল। একটু পরে আবিষ্কার করলাম সবাই তারেকের মতো 'ট' 'ট' করে কথা বলতে শুরু করেছে। প্লেট নিয়ে বলছে, "একটু ভাট ডাও।" যে দিচ্ছে সে বলছে, "ডিলাম টো, আর কট ডিব!" যে নিচ্ছে সে বলছে, "আরো ডাও। আরো ডাও। বেশি করে ডাও!" তারপর দুজনেই হি হি করে হাসি।

আমরা যখন খেতে বসেছি তখন ছোট মামাকে দেখলাম একটা প্লেটে ভাত-তরকারি নিয়ে মুখ শুকনো করে উপরে ছুটে যাচ্ছেন। কবি জাকারিয়া শামস নিশ্চয়ই তাকে পাঠিয়েছেন খাবারটা উপরে কেবিনে নিয়ে যাবার জন্যে। কবি মানুষেরা নিশ্চয়ই খুব আলসে হয়—ফুটফরমাস খাটার জন্যে একজন মানুষ না থাকলে তাদের খুব অসুবিধে। তারেকের ছোট মামা হচ্ছেন ফুটফরমাস খাটার সেই মানুষ!

যখন আমরা ভাবলাম আমাদের দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে, কিন্তু তখন আসলে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরুই হয় নি।

রাত্রে আমরা শোয়ার আয়োজন করছি তখন দেখি ছোট মামা মুখ শুকনো করে আমাদের কাছে এসেছেন। সুন্দরবন অভিযানের সময় আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা থেকে বেশি হয়ে গেছে—এই প্রথম তিনি আমাদের কাছে এলেন। তারেক জিজ্ঞেস করল, "কী খবর ছোট মামা?"

ছোট মামা কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "এই—ইয়ে—মানে—তোদের এখানে শোয়ার জায়গা আছে?"

তারেক অবাক হয়ে বলল, "কেন মামা?"

"না—মানে—ইয়ে—আমি কি রাত্রে এখানে শুতে পারব?"

তারেক আরো অবাক হয়ে বলল, "টুমি এখানে কেন শুটে চাইছ। টুমি না কেবিন ছাড়া ঘুমাটে পার না?"

ছোট মামা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না—মানে—ইয়ে আমাকে তো কবি জাকারিয়া শামসের কেবিনে দিয়েছে— উনি আবার সারা রাত গল্প করেন, তাই সারা রাত ঘুমাতে পারি না।"

আমরা নিজেরা নিজেরা গল্পগুজব করে ঘুমাই। এখন আবার এখানে ছোট মামা হাজির হলে সমস্যা হয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "কিন্তু আমাদের এখানে তো জায়গা নেই।"

ছোট মামা বললেন, "চাপাচাপি করে শুয়ে যাব।"

জয়ন্ত বলল, "চাপাচাপি করেও জায়গা হবে না।"

ছোট মামা অবিশ্যি আমাদের আপত্তি শুনলেন না, তার বিছানাপত্র নিয়ে গাদাগাদি করে আমাদের পাশে শুয়ে পড়লেন। শুধু যে শুয়ে পড়লেন তা না, কম্বল মুড়ি দিয়ে একেবারে নাকমুখ ঢেকে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলেন। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি কারো কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন। কার কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন সেটা বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হল না! আমার মনে হয় কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখি পড়া পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু তাদের সাথে ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। বড় আপু মনে হয় ঠিকই বলেছিল, কবি-সাহিত্যিকরা খুব ডেঞ্জারাস মানুষ।

রাত্রিবেলা আমরা সবাই শুয়েছি তখন হঠাৎ দেখি কবি জাকারিয়া শামস জাহাজের ডেকে নেমে এসে এদিক-সেদিক ইতিউতি করে কাকে যেন খুঁজছেন। নিশ্চয়ই ছোট

মামাকে কিন্তু ছোট মামা যেভাবে মাথা ঢেকে ঘাপটি মেরে ঘুমানোর ভান করছেন তাকে তো আর খুঁজে পাবেন না। আমাদের মনে হল কবি জাকারিয়া শামসকে একটু সাহায্য করা উচিত! তিনি যখন কাছাকাছি এলেন আমরা তখন একেবারে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, "ছোট মামা, ছোট মামা—"

ছোট মামা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

তারেক একটা চিউয়িংগামের স্টিক বের করে বলল, "চিউয়িংগাম খাবে?"

ছোট মামা ভীষণ রেগে বললেন, "আমার সাথে ফাজলেমি করিস? ঘুম থেকে তুলে চিউয়িংগাম? দেব একটা থাবড়া—"

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কবি জাকারিয়া শামস ছোট মামাকে দেখে ছুটে চলে এসেছেন! তার মুখে আনন্দের হাসি, "নূরু, তুমি এইখানে? আমি তোমাকে সারা জাহাজে খুঁজছি!"

ছোট মামা ভড়কে গিয়ে বললেন, "না—মানে—ইয়ে—"

"তুমি এইখানে ছোট বাচ্চাদের মাঝখানে শুয়ে আছ কেন? চল আমাদের কেবিনে।"

ছোট মামা আমতা-আমতা করে বললেন, "না, মানে এরা যদি রাত্রে একা একা ভয় পায়— সেজন্যে—"

আমরা একসাথে বললাম, "না—না, ভয় পাব না। আপনি কেবিনে চলে যান, এইখানে আপনার কষ্ট হবে।"

কবি জাকারিয়া শামস বললেন, "তুমি কালকে আমার ঘাড়টা মালিশ করে দিয়েছিলে, খুব আরামে ঘুম হয়েছে। আজকেও দেবে চল—"

কাঁচপোকা যেভাবে তেলাপোকাকে ধরে নিয়ে যায়, কবি জাকারিয়া শামস সেভাবে ছোট মামাকে ধরে নিয়ে গেলেন। আমি সব সময় ভাবতাম কবি-সাহিত্যিকরা খুব উঁচু শ্রেণীর মানুষ—তাদেরও যে ঘুমানোর আগে ঘাড় মালিশ করতে হয় সেটা আমি একেবারেই জানতাম না!

খুব ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙল। আমাদের স্লিপিং ব্যাগটাকে লেপের মতো পেঁচিয়ে তার ভেতরে গুটিসুটি মেরে আমি রেলিঙের পরদা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের চারপাশের বাড়িঘর গাছপালা গ্রাম ক্ষেত সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে তার বদলে চারদিকে ঘন বন। এই তা হলে পৃথিবীর বিখ্যাত সুন্দরবন?

আমি ধাক্কা দিয়ে অন্যদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললাম, "দেখ, দেখ! সুন্দরবনে এসে গেছি!"

সবাই ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলে রেলিঙের কাছে বসে বাইরে তাকাল। নদীর পাশে ঘন জঙ্গল দেখে সবার মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। সামনে-পিছনে যতদূর তাকানো যায় শুধু বন আর বন। কী গভীর বন মনে হয় এর ভেতরে আলো পর্যন্ত ঢুকবে না। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখি একটা হরিণ এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে বনের ধারে এসে নদীতে মুখ ডুবিয়ে পানি খেতে শুরু করেছে। আমরা চাপা স্বরে বললাম, "হরিণ! হরিণ!!"

আমাদের গলার স্বরে আরো কয়েকজনের ঘুম ভেঙে গেল, তারাও উঠে বসে বাইরে তাকাল, ঘুমঘুম চোখে তারাও অবাক হয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাদের পাশে বাবা-মা তার দুজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছে, তারাও ঘুম থেকে উঠে তাদের বাচ্চা দুজনকে ঘুম থেকে তুলে দেয়। পুরো পরিবার তখন রেলিঙের পাশে বসে গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সকালে নাশতার পর বলতে গেলে সবাই জাহাজের ছাদে এসে দাঁড়াল। দুই পাশে গভীর জঙ্গল সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছে। গভীর নদীর ভেতর দিয়ে চাপা শব্দ করে জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছে। আশপাশে যতদূর দেখা যায় কোথাও একজন মানুষ নেই। জাহাজের ছাদে এতগুলো মানুষ হইচই করছে, চেঁচামেচি করছে, তারপরেও কিন্তু মনে হচ্ছে কোথাও কোনো শব্দ নেই। খুব বড় একটা বনের ভেতর গেলে নিশ্চয়ই এরকম হয়। কিছুক্ষণ পরপর কোনো একজন চিৎকার করে উঠছিল "হরিণ হরিণ" তখন সবাই তার কাছে গিয়ে হরিণ দেখতে শুরু করে। তখন হয়তো অন্য একজন বলে "বানর বানর" তখন সবাই ছুটে যায় বানর দেখতে। ঠিক তখন আরেকজন চিৎকার করে ওঠে "কুমির কুমির" তখন সবাই ছুটে যায় কুমির দেখতে।

এর মাঝে কয়েকজন হচ্ছে পাখির এক্সপার্ট। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছে তারা পাখি ছাড়া আর কিছু দেখবে না। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তারা সব সময় পাখি দেখছে। তাদের আনন্দের কারণটা বোঝা খুব মুশকিল। ছোট চড়ুই পাখির মতো একটা ম্যাটম্যাটে পাখি দেখে তারা সবাই আনন্দে এত চিৎকার করতে লাগল যে মনে হল তারা বুঝি আস্ত একটা ডাইনোসর দেখে ফেলেছে।

সারা দিন সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজটা দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। সমুদ্রের কাছাকাছি খুব সুন্দর কয়েকটা দ্বীপের মাঝখানে এসে আমাদের জাহাজটা নোঙর করল। এত বড় জাহাজ তীরের কাছাকাছি যেতে পারবে না, ছোট ছোট নৌকা করে এই দ্বীপগুলোতে যেতে হবে।

আমাদের উৎসাহের সীমা নেই। জামা-জুতো পরে মাথায় টুপি লাগিয়ে হাতে ক্যামেরা আর বাইনোকুলার নিয়ে অপেক্ষা করছি। জাহাজের সাথে একটা ছোট নৌকা বাঁধা ছিল এখন সেটা দিয়ে লোকজনকে দ্বীপে পারাপার করা শুরু হল। প্রথমে গেলেন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা, সাথে আমাদের ছোট মামা। তাকে কেমন যেন মনমরা দেখা গেল—বিখ্যাত লোকের সেবা করে করে তার মনে হয় মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে।

আমরা শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠে গেলাম, সমুদ্রের নীল পানিতে ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড় বেয়ে কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের দ্বীপটাতে নামিয়ে দেওয়া হল। অভিযাত্রী সমিতির একজন সবাইকে বলে দিচ্ছে কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে। কেউ যেন হারিয়ে না যায়—আর অন্ধকার হবার অনেক আগেই যেন ফিরে আসে সেটা বারবার করে সবাইকে মনে করিয়ে দিল।

আমরা প্রথমে দ্বীপটার বালু বেলা দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম, তারপর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেলাম। কাজল একবার জিজ্ঞেস করল, "বাঘ আসবে না তো?"

আমি বললাম, "ধুর গাধা! এখানে নিশ্চয়ই বাঘ নেই—তা না হলে এখানে নামাবে কেন?"

জয়ন্ত বলল, "এটা একটা দ্বীপ, এখানে বাঘ কীভাবে আসবে? বাঘের জন্যে কি ফেরি সার্ভিস আছে?"

আমি বললাম, "আর বাঘ থাকলেই কী? আমরা বাঘকে ঘাঁটাব না, বাঘও আমাদের ঘাঁটাবে না।"

কাজল বলল, "যদি সত্যি সত্যি বাঘ আমাদের কাছে আসে কাসেম সেটাকে কিলিয়ে ভর্তা করে দেবে। তাই নারে কাসেম?"

কাসেম কথা না বলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল।

আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কাজটা মোটেও সহজ নয়। সেখানে এমনভাবে গাছপালা হয়ে আছে, লতা ঝুলে আছে, ডালপালা ছড়িয়ে আছে যে ভেতর দিয়ে যাওয়া মোটামুটি অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমরা এর মাঝে জেনে গেছি এখানকার গাছে শাঁসমূল বলে একটা জিনিস মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে থাকে, একটু সাবধানে পা না ফেললে পায়ে খোঁচা লাগে—তাই পাও ফেলতে হয় সাবধানে! পাঁচ জন মিলে সাবধানে পা ফেলে আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে থাকি। এই দ্বীপটা সমুদ্রের কাছে, দ্বীপটা মনে হয় নূতন ভেসে উঠেছে, সেজন্য গাছপালা একটু কম, তাই অনেক কষ্ট করে হলেও ভেতরে ঢুকতে পারছি।

জঙ্গলের ভেতরে অনেক দূর ঢুকে আমরা একটা ফাঁকা জায়গা পেলাম, সেখানে গাছের ডালে হেলান দিয়ে আমরা কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম—ঠিক তখন মনে হল আকাশে মেঘ ডাকল—আমরা অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, কীসের শব্দ এটি? আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, একটু মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, তার মাঝে মেঘ ডাকার শব্দ এল কোথেকে? ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছি ঠিক তখন আবার সেই শব্দটা শুনতে পেলাম, ভারি গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ, থেমে থেমে ভেসে আসছে।

তারেক ভুরু কুঁচকে বলল, "এটা কীসের শব্দ?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি না।"

জয়ন্ত বলল, "মনে হয় জাহাজের হুইসেল।"

কাজল বলল, "উঁহুঁ। আমাদের জাহাজের হুইসেল আরো কিনকিনে!"

"হয়তো অন্য লঞ্চ এসেছে। সেই লঞ্চের শব্দ।"

কাসেম বলল, "হয়তো বাঘ ডাকছে।"

আমি বললাম, "ধুর! বাঘ এইভাবে ডাকে নাকি?"

"তা হলে কীভাবে ডাকে?"

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম, বললাম, "ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলে শুনিস নি?"

দেখা গেল কেউই শোনে নি, আমিও শুনি নি—কিন্তু সেটা আর স্বীকার করলাম না। আমরা মেঘের গর্জনের মতো সেই শব্দকে পাত্তা না দিয়ে আরো কয়েকটা ছবি তুললাম। কাসেমকে বললাম খালি গায়ে টারজানের মতো ভঙ্গি করে একটা ছবি তুলতে কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না।

আমরা এবারে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করলাম, থেকে থেকে মাঝে মাঝেই সেই মেঘের গর্জনের মতো শব্দটা শোনা যেতে লাগল, কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালাম না। শব্দটা যাই হোক না কেন, গুরুতর কিছু না।

অনেকক্ষণ হেঁটে শেষ পর্যন্ত আমরা জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলাম। গাছগাছালি, পাতা, ডাল, কাঁটার ঘষা খেয়ে আমাদের হাত-পা-মুখ খানিকটা ছিলে গেল— কিন্তু বনজঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারে এলে এরকম খানিকটা হবে সেটা আমরা মেনেই নিয়েছিলাম। আমাদের জাহাজের প্রায় সবাই এই দ্বীপটাতে নেমে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অনেক মানুষের হইচই দিয়ে দ্বীপটা ভরে গিয়েছিল, কিন্তু এখন কোনো শব্দ নেই। আমরা বালু বেলা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে থাকি। অনেক দূরে পানিতে আমাদের বিশাল জাহাজটা ভাসছে, দূর থেকে দেখতে সেটাকে এত চমৎকার লাগছিল যে বলার মতো নয়। জাহাজটাকে পিছনে রেখে আমরা বেশ কতগুলো ছবি তুললাম।

বিকেল হয়ে আসছে। আমার মনে হয় ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি। বড় মানুষেরা ঠিক সময়ে ফিরে না এলে কেউ কিছু বলতে পারবে না, কিন্তু আমরা ছোট, আমাদের বকাবকি করতে কারো কোনো সমস্যা হবে না!

দ্বীপের কিনারায় এসে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, যারা যারা এই দ্বীপে নেমেছিল তারা প্রায় সবাই জাহাজের এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কিছু একটা দেখছে। তারা কী এত অবাক হয়ে দেখছে কে জানে? আমরা ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করলাম তারা কী দেখছে কিন্তু বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করে তারেক বলল, "সবাই আমাদের দেখছে।"

"আমাদের?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমাদের কেন?"

"জানি না—কিছু একটা হয়েছে মনে হয়।" আমরা যখন তীরে এসে পৌঁছেছি তখন জাহাজ থেকে ছোট নৌকাটা আমাদের নিতে এল। নৌকার ভেতরে জুয়েল ভাই এবং আরো দুজন মানুষ। একজনের খাকি পোশাক আর তার হাতে একটা বন্দুক। আমরা যখন নৌকায় উঠছি তখন জুয়েল ভাই বললেন, "কী সর্বনাশ! তোমরা ঠিক আছ?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন কী হয়েছে?"

"বাঘ।"

"বাঘ কোথায়?"

"এখানে। সাঁতরে এখানে বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে—গর্জন শোন নি?"

আমাদের পাঁচ জনের চোয়াল একসাথে ঝুলে পড়ল, আমরা বললাম, "বাঘের গর্জন?"

"হ্যাঁ। আমরা তাড়াতাড়ি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি কিন্তু তোমাদের পাই নি। তোমরা কোথায় ছিলে?"

"জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছিলাম।"

বন্দুক হাতে মানুষটা বলল, "খোদা মেহেরবান। খুব বেঁচে গিয়েছ। বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী খুব ডেঞ্জারাস।"

জুয়েল ভাই বললেন, "একটু পরে পরে ডাকছিল।"

বন্দুক হাতে মানুষটা বলল, "হ্যাঁ। তোমাদের সাবধান করছিল।"

"আমাদের—" আমরা অবাক হয়ে বললাম, "আমাদের?"

"হ্যাঁ। তোমাদের।" বন্দুক হাতে মানুষটা গম্ভীর গলায় বলল, "বাঘ সবাইকে দেখে। কেউ টের পায় না—কিন্তু তার এলাকাতে গেলে সে সব সময় চোখে চোখে রাখে।"

আমরা নৌকা করে ফিরে আসার পর সবাই আমাদেরকে ঘিরে ধরল কী হয়েছিল জানার জন্যে। বাঘের গর্জন শুনেও আমরা ভয় পাই নি শুনে সবাই চোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাদেরকে সবাই ভাবল একেবারে সবচেয়ে সাহসী না হলে সবচেয়ে বেকুব!

সবাই চলে যাবার পর কাসেম ক্যাঁক করে আমার ঘাড় ধরে বলল, "আমি যখন বললাম বাঘের ডাক তুই তখন সেটা উড়িয়ে দিলি মনে আছে?"

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, "ভুল হয়েছে। আর উড়াব না।"

কাজল কাসেমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই থাকতে আমাদের ভয় কী? বাঘ কাছে এলে কিলিয়ে ভর্তা করে দিতে পারবি না?"

কাসেম চোখ পাকিয়ে কাজলের দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

রাত্রিবেলা খেয়ে আমরা যখন শুতে যাব তখন জয়ন্ত ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, "তাড়াতাড়ি ছাদে আয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"আকাশে ফানুস উড়াচ্ছে।"

"ফানুস?"

"হ্যাঁ।"

কাজল জিজ্ঞেস করল, "ফানুস কেমন করে ওড়ায়?"

জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, "উপরে গেলেই দেখবি।"

আমরা স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে জুতো পরে আবার ছাদে চলে এলাম। সেখানে খুব হইচই করে ফানুস ওড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাঁশের ছিলকে দিয়ে বেশ বড় একটা রিং তৈরি করা হয়েছে তার উপরে ঘুড়ির পাতলা কাগজ দিয়ে তৈরি একটা ব্যাগের মতন। তার নিচে কিছু দড়ি, সেটাকে মোমে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। একজন রিংটাকে ধরে রাখল অন্য জন মোমে ভেজানো দড়ির গোছায় আগুন দিতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, আগুনের গরম হলকায় উপরের পাতলা ব্যাগের মতো জায়গাটা ফুলে ওঠে, ভালো মতো গরম বাতাসে ভরে উঠলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। সমুদ্রের কাছাকাছি, হু হু করে বাতাস বইছে, পাতলা ফানুসটা বাতাসে জাপটাজাপটি করছে, ঠিকমতো গরম বাতাসে ভর্তি হতে পারছে না। হঠাৎ করে সেটাতে আগুন ধরে গেল!

দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, যারা ফানুসটা ধরে রেখেছিল আগুনের হলকায় ভয় পেয়ে সেটাকে রেলিঙের উপর দিয়ে পানিতে ছুড়ে ফেলে দেয়—জ্বলন্ত আগুনের ফানুসটা দেখতে দেখতে পানিতে ডুবে গেল—আনন্দের ধ্বনি শোনা গেল একটা।

এবারে দ্বিতীয় ফানুসটা উড়ানোর প্রস্তুতি। এলোমেলো বাতাসে একটু অসুবিধে হচ্ছিল, একজন উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উপরে ধরে রেখেছে। সাবধানে আগুন দেওয়া হল, ফানুসটা গরম বাতাসে ভরে যাওয়ার সাথে সাথে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হল, আর কী সুন্দর দুলতে

দুলতে সেটা উপরে উঠতে থাকে। শুধু নিচে আগুন জ্বলছে কিন্তু পুরো ফানুসটাই এখন একটা বিশাল লাইট বালবের মতো জ্বলছে। ফানুসটা উপরে উঠতে উঠতে পিছনে সরে যেতে লাগল। প্রথমে বড় একটা আলো, সেই আলো ছোট হতে হতে একসময় একটা তারার মতো দেখাতে লাগল। আকাশে অনেক তারার মাঝে একটা এখান থেকে পাঠানো হয়েছে ভেবেই কেমন যেন অবাক লাগতে থাকে।

তিন নম্বর ফানুসটাতেও আগুন ধরে গেল। চার পাঁচ আর ছয় নম্বর ফানুসটা নিয়ে কোনো সমস্যা হল না। সেগুলো খুব সুন্দরভাবে আকাশে উড়ে আকাশের তারা হয়ে ভাসতে লাগল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটল সাত নম্বর ফানুসটাতে, সবকিছু চমৎকারভাবে কাজ করছিল; ছেড়ে দেবার পর সেটা যখন উপরে উঠতে শুরু করেছে তখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল, ফানুসটা পাক খেয়ে ওঠে, হঠাৎ সেখানে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরার সাথে সাথে গরম বাতাসটা বের হয়ে সেটা একটা আগুনের দলা হয়ে সরাসরি উপর থেকে নিচে আমাদের দিকে পড়তে শুরু করে, আমরা চিৎকার করে সরে যাবার চেষ্টা করলাম, আর সেই জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ডটা এসে পড়ল জাহাজের মাস্তুলে। সুন্দরবনের ভ্রমণ উপলক্ষে চমৎকার একটা রঙিন পাল টানানো হয়েছিল, দাউদাউ করে সেটাতে আগুন জ্বলে ওঠে।

জাহাজের ছাদে চেঁচামেচি হইচই চিৎকার শুরু হয়ে যায়, মনে হল পুরো জাহাজেই বুঝি আগুন ধরে যাবে। ছোট কয়েকটা বাচ্চা ভয় পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। আগুনের হলকাতে সবকিছু কিছুক্ষণের জন্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, কয়েকজন ছুটতে ছুটতে নিচে যায় পানি আনার জন্যে কিন্তু তার দরকার ছিল না, এমনিতেই আগুনটা একসময় নিভে গেল। জুয়েল ভাই তখন সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন, বলছেন, "আপনারা শান্ত হোন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি! কোনো ভয় নেই!"

দৌড়াদৌড়ি থামিয়ে একসময় সবাই শান্ত হয়ে আসে। যারা ফানুস তৈরি করেছে তারা অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কাছে আরো তিনটা ফানুস আছে, সেগুলো ছাড়বে কি না বুঝতে পারছে না! আমরা চিৎকার করে বললাম, "ছাড়বে! ছাড়বে! ছাড়বে!"

আমাদের সাথে সাথে অন্যেরাও চিৎকার করতে লাগল, "ছাড়বে! ছাড়বে!! ছাড়বে!!!"

কাজেই শেষ তিনটা ফানুসও ছাড়া হল। বাতাসের ঝাপটায় একটা উপরে ওঠার আগেই জ্বলে গেল, অন্য দুটো চমৎকারভাবে আকাশের তারা হয়ে জ্বলতে লাগল। দেখে বোঝাই যায় না কোনটা আসল তারা আর কোনটা ফানুস তারা!

আমরা যখন নিচে নেমে আসছি তখন জয়ন্ত বলল, "বুঝলি? ফানুস হচ্ছে একটা সাংঘাতিক জিনিস?"

"কেন?"

"আকাশের একটা তারা হচ্ছে বিশাল একটা ব্যাপার। একটা ফানুস কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সেই তারার সাথে কম্পিটিশনে যায়!"

জয়ন্ত কবি মানুষ, তার কথাবার্তায় একটু ভাব থাকে। আজকে ফানুস ওড়ানো দেখে তার ভাবটা বেশি। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "ফানুস নিয়ে একটা কবিতা লিখতে হবে। প্রথম লাইনটা হবে এরকম : ফানুস হয়ে জনম তোমার তারা হয়ে মরণ—"

কাজল দাঁত বের করে হি হি করে হেসে বলল, "তুই যদি কবি হয়ে যাস তখন কি তোর ঘাড়ও মালিশ করে দিতে হবে?"

কাজলের কথা শুনে আমরা সবাই হি হি করে হাসতে শুরু করলাম।

পরের দুদিন আমাদের জাহাজটা সুন্দরবনের ভেতর ঘুরে বেড়াল। কোনো একটা সুন্দর জায়গা দেখে সেটা নোঙর করত, আমরা নৌকা করে তীরে নেমে যেতাম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আবার ফিরে আসতাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লোকালয় পাওয়া যেত, সেখানে স্থানীয় মানুষেরা তাদের ছোট ছোট নৌকা নিয়ে আসত, সেই নৌকা ভাড়া করে তখন সুন্দরবনের আরো গহিনে যাওয়া যেত। এই কয়দিনে সবার সাথে সবার পরিচয় হয়ে গেছে, ছোট ছোট দল বেঁধে সবাই বের হয়ে যেত। শুধু জুয়েল ভাই কোথাও যেতেন না, তিনি জাহাজে বসে বসে সবার হিসাব করতেন, কারা কারা গিয়েছে, কারা ফিরে এসেছে—সেই হিসাব না মেলা পর্যন্ত যেন তার শান্তি নেই! এক জায়গা থেকে জাহাজ ছাড়ার আগে জুয়েল ভাই ঘুরে ঘুরে দেখতেন সবাই ফিরে এসেছে কি না! এতগুলো মানুষের দায়িত্ব সোজা কথা নয়।

যখন আমাদের আসল অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়ে গেছে যদিও সেটা আমরা তখনো বুঝতে পারি নি।

রাতে ঘুমানোর জন্যে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকতে যাচ্ছি তখন জয়ন্ত বলল, "আমার স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে কেমন যেন বোটকা একটা গন্ধ।"

আমি শুঁকে দেখি, আমারটার ভেতরেও বোটকা গন্ধ। কাজল দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভেতরে নিশ্চয়ই ইঁদুর মরে পচে আছে।"

স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ইঁদুর মরে পচে থাকলে সেটা কাজলের মতো খবিশের জন্যে কোনো সমস্যা নাও হতে পারে কিন্তু আমাদের জন্যে সমস্যা! আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের স্লিপিং ব্যাগ উল্টে ঝেড়ে নিলাম—কোথাও কোনো মরা ইঁদুর নেই। আবার যখন ঘুমানোর জন্যে ভেতরে ঢুকছি তখন আবার সেই বোটকা গন্ধ। তারেক কয়েকবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "বুঝেছি।"

"কী বুঝেছিস?"

"গন্ধটা কোঠা ঠেকে আসছে!"

"কোথা থেকে?"

"আমাডের শরীর ঠেকে। আমরা পাঁচ ডিন গোসল করি নাই।"

তখন আমাদের সবারই মনে পড়ল যে আসলেই আমরা পাঁচ দিন গোসল করি নি। শরীরের মাঝে একটা চিটচিটে ভাব, সেটা নিশ্চয়ই পাঁচ দিনের ময়লা থেকে এসেছে। জয়ন্ত বলল, "আমরা পাঁচ দিন কাপড়ও বদলাই নি!"

তারেক বলল, "সর্বনাশ! আমার আম্মু আমাকে খুন করে ফেলবে!"

কাজল বলল, "কেন?"

"আম্মু বলেছে প্রট্যেকডিন কাপড় বডলাটে।"

কাজল বলল, "চারদিকে এত মানুষ কেমন করে কাপড় বদলাবি? দেখে ফেলবে না?"

"স্লিপিং ব্যাগের ভিটরে ঢুকে।"

বুদ্ধিটা খারাপ না, আমরা তাই স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে কাপড় বদলাতে শুরু করলাম। শুয়ে শুয়ে কাপড় বদলানো কাজটা রীতিমতো জটিল, আমাদের অনেক সময় লেগে গেল। কিন্তু পাঁচ দিনের নোংরা চিটচিটে কাপড় বদলানোর পর শরীরটা ঝরঝরে লাগতে থাকে—যদি কোনোভাবে গোসলটাও করে নিতে পারতাম, তা হলে আরো ভালো লাগত। আমরা নদীর উপরেই আছি, কিন্তু নদীর পানি লোনা, কাদার মতো ঘোলা—এই পানি দিয়ে গোসল করলে মনে হয় উল্টো ব্যাপার হবে!

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে পেলাম আমাদের জাহাজটা যাচ্ছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা নিশ্চয়ই দেখব নূতন একটা জায়গায় চলে এসেছি! একেকদিন একেক জায়গায় দিন কাটাই—মজা মন্দ হচ্ছে না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি জাহাজটা একটা জেটিতে বাঁধা। তীরে কিছু বাড়িঘর, বাড়িঘরের সামনে ফুলবাগান, দেখে মনে হয় সরকারি অফিস। একটা সাইনবোর্ডও আছে কিন্তু এত দূর থেকে সেটা পড়া গেল না।

আমরা যখন স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের হয়ে আসছি তখন দেখলাম ছোট মামা আমাদের কাছে আসছেন। যারা এখানে এসেছে এই কয়দিনে সবার চেহারাতেই একটা বন্য ছাপ পড়েছে, তবে ছোট মামার ছাপটা অন্যরকম। তাকে কেমন যেন খ্যাপা খ্যাপা দেখাচ্ছে। ছোট মামা বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি।"

তারেক অবাক হয়ে বলল, "চলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"সাংবাদিকের একটা দল ফিরে যাচ্ছে তাদের সাথে।"

"তারা কীভাবে যাচ্ছে?"

"একটা লঞ্চ যাচ্ছে মংলার দিকে। সেখান থেকে বাস।"

"তা হলে আমরা?"

"তোরা যেতে চাইলে আয়—"

আমরা মাথা নাড়লাম, কেউ আমরা যেতে চাই না। এই দুই দিনে অনেক হরিণ দেখেছি, কিন্তু এখনো একটা বাঘ দেখি নাই। সুন্দরবনে এসে একটা বাঘ না দেখে কেমন করে যাই?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?"

ছোট মামা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললেন, "একটা আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছি।"

"পাগল?"

'হ্যাঁ। কবি জাকারিয়া শামস। এত বিখ্যাত একজন কবি, কিন্তু পুরা পাগল।"

জয়ন্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "উনি কী করেন?"

"কী করে না সেটা বল! রাত দুপুরে ঘুম থেকে তুলে বলে তার গা টিপে দিতে। বিখ্যাত কবি হয়েছে বলে তার গা টিপে দিতে হবে কেন?"

তারেক বলল, "টুমি না টিপলেই পার।"

মামা মুখ ভোঁতা করে মাথা নাড়লেন, বললেন, "তখন গালাগাল শুরু করে। পুরা উন্মাদ।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমাকে কেবিন থেকে বের হতে দেয় না।"

আমরা কী করব বুঝতে না পেরে ছোট মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোট মামা মুখটা বিকৃত করে বললেন, "বাসায় কবি জাকারিয়া শামসের কয়েকটা কবিতার বই আছে। বাসায় গিয়েই বইগুলো জ্বালিয়ে দিতে হবে।"

একজন কবি যদি বদ্ধ উন্মাদ হয় তা হলে তার বই কেন জ্বালিয়ে দিতে হবে আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমাদের মনে হল এখন এই প্রশ্ন করাটা ঠিক হবে না।

মামা বললেন, "তোরা এই জাহাজে ধীরেসুস্থে আয়, আমি পালাই।"

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছোট মামা উঠে দাঁড়ালেন, ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন, তারপর হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন।

নাশতা করার সময় আমরা খবর পেলাম এখানে তীরে একটা পুকুর আছে, ইচ্ছে করলে সেখানে গোসল করা যায়। যারা গোসল করতে চায় তারা যেন জামাকাপড় তোয়ালে নিয়ে নামে। আমরা নাশতা শেষ করে তাড়াতাড়ি আমাদের ব্যাকপেকে জামাকাপড় ভরে নেমে গিয়ে পুকুরটা খোঁজ করতে লাগলাম। ফরেস্ট অফিসের পিছনে দুটো পুকুর, একটা খাওয়ার পানির জন্যে, সেখানে কেউ নামতে পারে না। অন্যটাতে গোসল করা যায়। এখন খুব সকাল তাই ঠাণ্ডা, আরেকটু বেলা হলে এই পুকুরে গোসল করে নেওয়া যাবে।

আমরা ফরেস্ট অফিসের আশপাশে একটু হেঁটে বেড়ালাম। নদীর তীরে এসে দেখি একটা ট্রলারে পাখির এক্সপার্টরা উঠেছে, তারা নিশ্চয়ই কোথাও পাখির সন্ধানে যাচ্ছে। একটু পরে সেখানে ছোট মামা আর সাংবাদিকেরাও উঠল। এই ট্রলারটা নিশ্চয়ই পাখির এক্সপার্টদের কোথাও নামিয়ে ছোট মামা আর সাংবাদিকদের লঞ্চঘাটে নিয়ে যাবে। দেখলাম আরো কিছু মানুষ ট্রলারে উঠল। জয়ন্ত আমাকে বলল, "আয় আমরাও যাই।"

কাজল বলল, "ধুর। পাখি দেখে কী হবে?"

"তোকে পাখি দেখতে হবে কেন? তোর যেটা ইচ্ছা সেটা দেখবি।"

আমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলাম, এটা দুপুরের আগেই ফিরে আসবে। শুধু শুধু ফরেস্ট অফিসের সাজানো-গোছানো ফুলের বাগান দেখা থেকে দূরে কোথাও যাওয়া আরো মজার ব্যাপার হবে। আমরা আমাদের ব্যাকপেক কাঁধে নিয়ে ট্রলারে উঠে পড়লাম। সবাই মোটামুটি খালি হাতেই উঠেছে, শুধু ছোট মামা, সাংবাদিক আর আমাদের সাথে ব্যাগ। কয়েকজন মনে করল আমরাও বুঝি আজকে চলে যাচ্ছি। একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমরাও চলে যাচ্ছ নাকি?"

আমি উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলতেই ভটভট করে প্রচণ্ড শব্দে ট্রলারের ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে উঠল, উত্তরটা আর দিতে পারলাম না। অবশ্য এই মুহূর্তে উত্তর দিয়ে কোনো লাভ নেই, কেউ কোনো কথা শুনতে পারবে না। ভাবলাম নামার পরেই বলব।

ট্রলারে প্রায় আধা ঘণ্টা যাবার পর একটা গহিন বনের কাছে ট্রলারটা থামল। সবাই হুড়োহুড়ি করে নামতে থাকে। একজন সাংবাদিক আরেকজনকে বলল, "এখানে যখন এসেছি, কয়টা ছবি খিঁচে যাই।"

আরেকজন বলল, "দেরি হয়ে যাবে।"

প্রথমজন বলল, 'হবে না দোস্ত। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে মারব।"

সাংবাদিকেরা যখন পত্রিকায় লিখে তখন কত সুন্দর ভাষায় লিখে, এমনিতে যখন কথা বলে তখন দেখি আমাদের মতো ভাষায় কথা বলে। সাংবাদিকেরা নেমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, একজন ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে ছবি 'খিচতে' লাগল। একজন সিগারেট ধরিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমরা যখন নামছিলাম তখন ছোট মামা বললেন, "তোমরা সাবধানে থাকবে।"

তারেক বলল, "ঠাকব ছোট মামা।"

ছোট মামা বললেন, "আমি সদরঘাটে তোদের রিসিভ করতে চলে আসব।"

"ঠিক আছে ছোট মামা।"

"থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এই পাগলা কবির জ্বালায় থাকা গেল না। সারা রাত ভ্যাদরভ্যাদর করে।"

আমরা কোনো কথা বললাম না।

ছোট মামা বললেন, "গভীর রাতে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলে, যাও চা বানিয়ে আন। আমি কি তার বাপের গোলাম নাকি?"

আমরা এবারেও কোনো কথা বললাম না।

ছোট মামা বললেন, "আমার খুব ভালো একটা শিক্ষা হল। তোরাও শিখে রাখ, কবি-সাহিত্যিক থেকে সব সময় এক শ হাত দূরে থাকবি।"

আমরা এবারেও কথা না বলে মাথা নাড়লাম। ছোট মামা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তার গাল চুলকাতে লাগলেন, সারা মুখে ছোট ছোট দাড়ি গজিয়েছে, সেগুলো নিশ্চয়ই চুলকায়। আমরা ছোট মামাকে আর না ঘাঁটিয়ে ট্রলার থেকে নেমে পড়লাম। অন্য যারা এসেছে তারাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে পাখির এক্সপার্টদের দেখা গেল তারা মাটিতে শুয়ে বাইনোকুলার দিয়ে পাখি দেখছে। আমরা সেদিকে গেলাম না, তারা যে পাখি দেখছে হঠাৎ করে সেই পাখি উড়ে গেলে তারা আমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবে। এই কয়দিনে আমরা পাখির এক্সপার্টদের দেখে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি—পাখি আর মানুষদের মাঝে তারা পাখিদের বেশি পছন্দ করে।

আমরা তখন অন্যদিক দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে কাজল বলল, "জয়ন্ত তুই কি বড় হয়ে কবি হবি?"

"কেন?"

"তা হলে তোর থেকে এক শ হাত দূরে থাকতে হবে। ছোট মামা বলেছে না!"

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম, শুধু কাসেম বলল, "বেচারা ছোট মামা।"

এরকম সময় আমরা ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। যেখানে আছি সেখান থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই ছোট মামা আর সাংবাদিকদের নিয়ে ট্রলারটা চলে যাচ্ছে। ট্রলারটা যখন ফিরে আসবে তখন আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে—আমাদের জন্যে যদি অন্যদের ফিরে যেতে দেরি হয় তা হলে সবাই খুব বিরক্ত হবে। ছোট হওয়ার অনেক যন্ত্রণা।

আমরা নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটতে থাকি। সামনে একটা ছোট খাল, পানি বলতে গেলে নেই, তবে অনেক কাদা। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, তার ওপর পা দিয়ে সাবধানে খালটা পার হয়ে এলাম। কাসেম বলল, "বেশি দূর যাসনে।"

"কেন?"

"যদি বাঘ আসে!"

কাসেমের খুব বাঘের ভয়। আমি হি হি করে হেসে বললাম, "বাঘ যদি আসে তা হলে তোকেই ধরে নেবে! আমাদের ধরবে না। আমাদের কারো গায়ে গোশত নেই, শুধু তোর শরীরে গোশত!"

কাসেম কোনো কথা না বলে চোখ লাল করে আমার দিকে তাকাল। আমরা আরো কিছুদূর হেঁটে গেলাম। আমরা প্রথমে একটু একটু কথা বলছিলাম, কিন্তু এই বিশাল জঙ্গলে আমরা কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে হাঁটছি, আমাদের কেন জানি মনে হতে লাগল জোরে কথা বলে আমরা এখানকার শান্তি নষ্ট করে ফেলছি। তখন আস্তে আস্তে আমরা কথা কমাতে কমাতে একসময় একেবারে চুপ করে গেলাম। তখন হঠাৎ মনে হল আমরা বুঝি প্রথমবার সত্যিকারভাবে সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্যটা ধরতে পেরেছি। এই সুন্দরবনের সৌন্দর্য শুধু বন্য পশুপাখির মাঝে না, এর নানারকম বিচিত্র গাছের মাঝেও না—এর আসল সৌন্দর্য হচ্ছে এর চুপচাপ নৈঃশব্দ্যের মাঝে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা আরো একটা ছোট খালের কাছাকাছি চলে এসেছি, বড় একটা গাছ সেখানে বাঁকা হয়ে পানিতে ঝুঁকে পড়েছে। আমরা সেই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লাম। কেউ কোনো কথা বলছি না, চুপচাপ গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে এই বিশাল অরণ্যের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা কেউ কাউকে কিছু বলি নি, কিন্তু নিজেরা নিজেরাই বুঝে গিয়েছি এখন এখানে চুপ করে বসে থাকতে হবে। আমাদের কী ভালো যে লাগছিল সেটি আর বলে বোঝানোর মতো নয়।

আমরা কতক্ষণ এখানে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমাদের পা পানিতে ভিজে আসছে। জয়ন্ত বলল, "কী হল খালে এত পানি এসেছে কোথা থেকে?"

আমি বললাম, "জোয়ারের পানি।"

কাজল বলল, "জোয়ারের সময় এত পানি কোথা থেকে আসে?"

আমি চাঁদের আকর্ষণে কেমন করে জোয়ার-ভাঁটা হয় সেটা বোঝানো শুরু করছিলাম ঠিক তখন ট্রলারের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম। কাসেম বলল, "সর্বনাশ! ট্রলার চলে এসেছে।"

জয়ন্ত বলল, "তাড়াতাড়ি। আমাদের না দেখলে সবাই খুব বিরক্ত হবে।"

"হ্যাঁ।" আমি বললাম, "তাড়াতাড়ি। পাখি এক্সপার্টরা এক সেকেন্ড পাখি না দেখলেই কেমন জানি রেগে যায়!"

আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথে দৌড়ে যেতে থাকি। সবার পিছনেই একটা করে ব্যাকপেক, ব্যাকপেক নিয়ে দৌড়ানো খুব সহজ না, গোসল করার জন্যে শুধু কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে এলেই হত—তাড়াহুড়ো করে বোকার মতো পুরো ব্যাকপেক নিয়েই চলে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে কাজটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।

আমরা ছুটতে ছুটতে শুকনো খালটার কাছে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। শুকনো যে খালটার উপরে একটা গাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে আমরা পার হয়ে এসেছিলাম সেই

খালটা এখন জোয়ারের পানিতে ভরে উঠেছে, পার হওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম—খালটা পার হয়ে এই পাশে আসার সময় আমরা একবারও চিন্তা করি নি, এরকম একটা সমস্যা হতে পারে।

আমরা শুনতে পেলাম ট্রলারটা এসে থামল। লোকজনের কথা শুনতে পাচ্ছি, সবাই নিশ্চয়ই ট্রলারে উঠছে। আমাদেরকে না দেখে তারা নিশ্চয়ই এখন একটু বিরক্ত হয়ে উঠছে—কিন্তু কিছু করার নেই। খালটা কীভাবে পার হওয়া যায় সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম ট্রলারের ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়েছে। আমরা একটু অবাক হয়ে গেলাম, আমাদের না নিয়েই চলে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। জুয়েল ভাই সবাইকে এক শ' বার করে বলে দিয়েছেন যাদেরকে নিয়ে যাবে তাদের সবাইকে নিয়ে ফিরে আসতে হবে। কাজেই সবাই যত বিরক্তই হোক না কেন আমাদের না নিয়ে তারা ফিরে যেতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ করে ট্রলারের ইঞ্জিনের শব্দটা বেড়ে গেল এবং মনে হল ট্রলারটা ছেড়ে দিচ্ছে। তা হলে কি সত্যি সত্যি আমাদের না নিয়েই চলে যাচ্ছে। ভয়ানক একটা চিন্তা আমার মাথার মাঝে খেলে গেল—আমি চিৎকার করে উঠলাম, "দাঁড়ান—দাঁড়ান—যাবেন না—"

আমার সাথে সাথে অন্যেরাও চিৎকার করে উঠল কিন্তু ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট শব্দে পাশের মানুষের কথাই শুনতে পাওয়া যায় না—আমাদের চিৎকার শুনবে কেমন করে? আমি তখন খালের পানিতেই লাফিয়ে পড়লাম। কাদায় পা গেঁথে গেল, তার মাঝে কোনোমতে এগিয়ে যাই, পানিতে বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে সেই অবস্থায় কোনো ভাবে হেঁটে অন্য পাশে উঠে গেলাম, তারপর চিৎকার করে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে আমি শুনতে পেলাম ট্রলারটা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোনোভাবে যখন নদীর তীরে এসেছি তখন দেখলাম ট্রলারটা নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করছি, হাত নাড়ছি কিন্তু ট্রলারের কেউ আমাকে দেখতে পেল না, আমার কথা শুনতে পেল না। আমি হঠাৎ করে অমানুষিক একটা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম!

কিছুক্ষণের মাঝে অন্যেরাও ছুটতে ছুটতে এসে আমার সাথে যোগ দিল। সবাই ভিজে চুপসে আছে, সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। জয়ন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "চলে গেছে?"

আমি মাথা নাড়লাম। কাজল বলল, "চলে গেল কেন?"

আমি গলায় জোর পাচ্ছিলাম না, তারপরেও চেষ্টা করে শুকনো গলায় বললাম, "বুঝতে পারছিস না?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"সবাই ভেবেছে আমরা ছোট মামা আর সাংবাদিকদের সাথে আগেই চলে গেছি। আমরা যে এখানে আছি সেটা কেউ জানে না।"

"কেন? সেটা কেন কেউ জানে না?"

"সবাই জানে ছোট মামা আমাদের গার্জিয়ান। সবাই দেখেছে ছোট মামার সাথে আমরা ব্যাগ নিয়ে বের হয়েছি।"

জয়ন্ত মাথা নাড়ল, ফ্যাকাসে মুখে বলল, "হ্যাঁ। মনে নেই ট্রলারে একজন ইবুকে জিজ্ঞেস করল আমরা সাংবাদিকদের সাথে চলে যাচ্ছি কি না?"

কাসেম আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই তখন কী বলেছিলি?"

"কিছু বলতে পারি নি। ট্রলারটার ইঞ্জিন ঠিক তখন স্টার্ট হল।"

তারেক এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি, এবারে আস্তে আস্তে বলল, "টার মানে আমাডের কেউ খোঁজ করবে না?"

আমি বললাম, "না। যখন সবাই ঢাকা পৌছবে, যখন দেখবে আমরা সেখানে নাই, তখন বুঝবে আমরা এখানে রয়ে গেছি।"

"টার মানে, টিনডিন পর?"

"হ্যাঁ। তিন দিন পর।"

কাজল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিন্তু—আমাদের স্লিপিং ব্যাগ?"

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে স্লিপিং ব্যাগের?"

"সেগুলো তো জাহাজে রয়ে গেছে! যখন দেখবে আমরা ঘুমাতে আসছি না—"

আমি মাথা নাড়লাম। "উঁহুঁ।"

কাজল রেগে বলল, "কী উঁহুঁ?"

"মনে নাই আজ সকালে ডেক ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার জন্যে সবাইকে বিছানা গোটাতে বলেছে? আমরা স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে উপরে ঠেসে রেখেছি। কেউ জানবেও না আমরা স্লিপিং ব্যাগ রেখে এসেছি!"

কাজল একটা গালি দিয়ে মাটিতে পা দিয়ে একটা লাথি মারল। তারপর হঠাৎ আমাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "জুয়েল ভাই?"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে জুয়েল ভাইয়ের?"

"জুয়েল ভাই আমাদের খোঁজ করবেন না?"

জয়ন্ত বলল, "নিশ্চয়ই খোঁজ করবেন। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"সবাই জুয়েল ভাইকে বলবে আমরা ছোট মামার সাথে চলে গেছি।"

"জুয়েল ভাই কি সেটা বিশ্বাস করবেন?"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "করতেও পারেন। আমরা কাউকে না বলে বাড়ি থেকে পালাই সেই খবরটা তো পত্রিকাতেই এসেছে—সারা বাংলাদেশের মানুষ পড়েছে। জুয়েল ভাই তাই ভাবতে পারেন—আমরা বুঝি আসলেই এরকম। কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই।"

কাজল আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। কাসেমের মুখ আস্তে আস্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, সে ফিসফিস করে বলল, "এখন কী হবে?"

আমরা সবাই কাসেমের দিকে তাকালাম, তার গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তার ভয়টাও মনে হয় সবচেয়ে বেশি।

তারেক একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এটডিন আমরা শুধু অ্যাডভেঞ্চারের ভান করেছি। এখন হবে সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার!"

জয়ন্ত কবিতার মতো ছন্দ মিলিয়ে বলল : "সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার!"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চার। যদি কেউ আমাডের নিটে না আসে টা হলে টিনডিন আমাডের এই জঙ্গলে ঠাকটে হবে।"

কাসেম বলল, "তি-ন-দি-ন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ তিন দিন।"

কাসেম বলল, "আ-আ-আমাদের বাঘে খেয়ে ফেলবে।"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "খাবে না।"

কাসেম চোখ-মুখ লাল করে বলল, "কেন খাবে না?"

"খেটে ডিব না। সেইটাই হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার।"

কাজল পিঠের ব্যাকপেক খুলে নিচে রেখে মাটিতে বসে পড়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমার আসলে তোদের সাথে আসাই ঠিক হয় নাই। আব্বুর কথা শোনা উচিত ছিল। বাসায় থাকা উচিত ছিল। তাহলে এত বড় বিপদে পড়তাম না।"

আমি বললাম, "দেখ কাজল এইভাবে কথা বলবি না।"

কাজল রেগে বলল, "কী হবে বললে?"

"আমরা সবাই এখানে একসাথে আছি। বিপদ তোর একার হয়েছে?"

কাজল রেগে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তারেক গলা উঁচিয়ে বলল, "ঝগড়া করবে না। টোমরা ঝগড়া করবে না। খবরডার।"

তারেক সাধারণত গলা উঁচিয়ে কথা বলে না, আমরা একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, তারপর ঝগড়া বন্ধ করে ফেললাম। তারেক বলল, "আমরা এখন খুব ঠাণ্ডা মাঠায় চিন্টা করব কী করা যায়।"

আমি বললাম, "তার আগে এই ভিজে কাপড়গুলি বদলাতে হবে। ঠাণ্ডা লাগছে।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ। এখন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলে খবর আছে।"

কাজেই প্রথমে আমরা ভিজে কাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরে নিলাম। ফরেস্ট অফিসের পুকুরে গোসল করে এই কাপড় পরার কথা ছিল কিন্তু এখন সেটাকে অনেক দূরের একটা বিষয় মনে হচ্ছে!

আমরা ভিজে কাপড়গুলো গাছের ডালে শুকানোর জন্যে নেড়ে দিলাম। কাদা লেগে কাপড়গুলোর যে অবস্থা শুকালেও যে খুব একটা কাজে লাগবে সেরকম মনে হয় না। তারপর পাঁচ জন গোল হয়ে বসলাম এবং একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। তারেক বলল, "আমাডের প্রঠমে যে জিনিসটা লাগবে সেইটা হচ্ছে—"

কাসেম বলল, "খাবার।"

তারেক মাথা নাড়ল, "উঁহুঁ।"

কাজল বলল, "পানি।"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল "উঁহুঁ। আমাডের ডরকার সাহস। আমাদের নিজেডের ভিটরে সাহস রাখটে হবে।"

আমি মাটিতে একটা কিল দিয়ে বললাম, "আছে আমাদের সাহস!"

অন্যেরাও মাটিতে কিল দিয়ে বলল, "একশ বার।"

আমি বললাম, "আমাদের যখন এখানেই থাকতে হবে তা হলে প্রথমে আমরা এই জঙ্গলটা দখল করে নেই।"

কাজল অবাক হয়ে বলল, "দখল করে নিবি? কীভাবে?"

"এই যে এইভাবে।" বলে আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "আপনারা যে যেখানে আছেন, সবাই শোনেন, আমি এই পুরো জঙ্গলটা দখল করে নিলাম। আমি তিন পর্যন্ত গুনব তার মাঝে কেউ যদি আপত্তি না করেন তা হলে এই জঙ্গলটা হয়ে যাবে আমার। এক— দুই— তিন!"

সাথে সাথে সবাই চিৎকার করে হাততালি দিল যেন সত্যি সত্যি জঙ্গলটা আমি দখল করে নিয়েছি। কাজল দাঁত বের করে বলল, "জঙ্গলটা যখন দখল করে নিয়েছি তখন একটা নাম দেওয়া যাক।"

"হ্যাঁ, কী নাম দেওয়া যায়?"

জয়ন্ত বলল, "সবার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে নাম দিই!"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, 'গুড আইডিয়া।"

খানিকক্ষণ আলোচনা করে নাম ঠিক করা হল, কাই-কাতাজ! আমরা সবাই মাথা নেড়ে বললাম, একেবারে ফাটাফাটি নাম হয়েছে, শুধু কাসেম হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তোদের সবার মাথা খারাপ। এরকম বিপদের সময় কেউ এরকম ইয়ারকি করে?"

আমরা কাসেমের কথাটা গায়ে মাখলাম না, এভাবে ঠাট্টা-তামাশা করে বিপদটার কথা ভুলে থাকা যাচ্ছে সেটা কম কথা না। তারেক বলল, "এখন ডুই নম্বর কাজ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেইটা কী?"

"আমাডের কাছে কী কী আছে সেইটা ডেখা যাক।"

আমরা আমাদের ব্যাকপেক খুলে ভেতরে কী কী আছে দেখতে লাগলাম। জাহাজে আমাদের খাবার দেবে জানার পরও আমাদের আম্মুরা ব্যাকপেক ঠেসে খাবার দিয়ে দিয়েছিলেন, তখন সেটা নিয়ে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম কিন্তু এখন সেটা দেখেই আমাদের যা আনন্দ হল সেটি আর বলার মতো নয়।

জয়ন্ত বলল, "মা আরো জুস দিতে চেয়েছিল কেন যে নিলাম না!"

আমি বললাম, "যে কয়টা আছে সেটা খারাপ না।"

কাসেম বলল, "তিন দিন চলবে না।"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "খুব অল্প করে খেটে হবে। পানি আমাডের সবচেয়ে বড় সমস্যা।"

ব্যাকপেকে আমাদের কয়েক প্রস্থ কাপড় আছে। সেটা খারাপ না—রাত্রে যখন ঠাণ্ডা পড়বে তখন এগুলো পরে নিতে হবে। সবার কাছেই একটা চাকু আছে। ক্যামেরা আর বাইনোকুলার এখন কোনো কাজে আসবে না। কাজলের ব্যাকপেকে একটা ম্যাচ দেখে আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু ম্যাচ দিয়ে আগুন জ্বালাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম খাল পার হওয়ার সময় ব্যাকপেকে পানি ঢুকে ম্যাচটা ভিজে গেছে।

আমি বললাম, "ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই। ম্যাচ কাঠিগুলো খুলে রৌদ্রে শুকাতে দে।"

তখন তখনই ম্যাচ কাঠিগুলো বের করে একটা শুকনো কাপড়ের উপর রেখে রৌদ্রে শুকাতে দিলাম।

জয়ন্তের ব্যাকপেকে ফার্স্টএইড বক্স এবং নানারকম ওষুধ পাওয়া গেল। মাথাব্যথা কিংবা জ্বরের ওষুধ কাজে লাগতে পারে কিন্তু একগাদা অ্যালার্জির ওষুধ কিংবা ঘুমানোর ওষুধ

কী কাজে লাগতে পারে বুঝতে পারলাম না। আমাদের সবার কাছেই একটা করে টর্চ লাইট আছে। যাদের টর্চ লাইট ভিজে গিয়েছিল সেটা মুছে শুকিয়ে নেবার পর আবার কাজ করতে শুরু করল। সবার ব্যাকপেকেই নোট বই, কলম এবং পেনসিল পাওয়া গেল। কাজলের ব্যাকপেকে একটা ডিটেকটিভ বই এবং জয়ন্তের ব্যাকপেকে কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র পাওয়া গেল। ডিটেকটিভ বইটা পাতলা, কোনো কাজে লাগবে না, তবে জীবনানন্দ দাশের বইটা মোটা এবং ভারী, ঠোকাঠুকির কাজে লাগানো যাবে। আগুন জ্বালানোর জন্যে ব্যবহার করলেও বেশ অনেকক্ষণ জ্বলবে। তবে কলম-পেনসিলগুলো এখন কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।

নাইলনের দড়ি থাকলে খুব কাজে লাগত কিন্তু আমাদের কারো কাছেই দড়ি নেই। যদি শুধু জানতাম আমাদের এই অবস্থা হবে তা হলে ব্যাকপেক ভরে দড়ি নিয়ে আসতাম!

তারেক বলল, "যদি কোনো জন্টু-জানোয়ার আসে সেই জন্যে আমাদের কিছু অস্ত্র বানানো ডরকার।"

কাজল জিজ্ঞেস করল, "কী রকম অস্ত্র?"

"বড় মোটা লাঠিটার আগায় চাকুগুলো বেঢে নিটে হবে।"

তারেকের মাথায় বুদ্ধি আছে, এই ছোট চাকুগুলো আসলে কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু মোটা একটা লাঠির মাথায় বেঁধে নিলে এটা বর্শার মতো একটা অস্ত্র হয়ে যাবে।

আমরা তখন ভালো মোটা শক্ত লাঠি খোঁজ করতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে এই একটা জিনিস পাওয়া খুব সহজ—বেছে বেছে চমৎকার দেখে পাঁচটা গাছের বড় ডাল খুঁজে আনলাম। শুকনো অংশগুলো ছেঁটে ফেলে দিয়ে ডালগুলো চেছে নিলাম। আগায় চাকুগুলো বাঁধা একটু সমস্যা হল, তখন আমাদের শার্টের তলা থেকে ইঞ্চিখানেক ফিতার মতো করে কেটে নিয়ে সেটা পাকিয়ে দড়ির মতো করে সেটা দিয়ে বেঁধে নিলাম।

ঠিক কী কারণ জানি না, এই শক্ত মোটা লাঠিগুলো হাতে নিতেই আমাদের বুকের মাঝে সাহস এক শ' গুণ বেড়ে গেল। আমরা তখন মোটামুটি সশস্ত্রভাবে এই দ্বীপটা দেখতে বের হলাম। রাত্রে ঘুমানোর জন্যে এখনই একটা জায়গা ঠিক করে রাখা দরকার।

আমরা যখন জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছি তখন প্রথমবার আমাদের মনে হল আমরা বুঝি আসলেই একটা সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়েছি।

যখন আমরা বুঝতে পারলাম সুন্দরবনে অ্যাডভেঞ্চারটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার।

সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নূতন একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, সেটা হচ্ছে এখানে যত গাছপালা তত খাল। শুধু যে খাল তাই নয়, সেখান থেকে বের হয়েছে বাচ্চা-খাল আর বাচ্চা-খাল থেকে বের হয়েছে নাতি-খাল, নাতি-খাল থেকে বের হয়েছে পুতি-খাল। ভাটার সময় এই সব খাল থেকে পানি নেমে যায়, থাকে শুধু কাদা। জোয়ারের সময় আবার পানিতে ভরে ওঠে। মানুষ যেভাবে নিশ্বাস নেয় বাতাস দিয়ে, সুন্দরবন যেন

সেভাবে নিশ্বাস নেয় লোনা পানি দিয়ে। ব্যাপারটা খেয়াল করলে জয়ন্ত নির্ঘাত এটা নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলবে—তার প্রথম লাইনটা হবে এরকম :

"লোনা পানিতে বুক ভরি নিশ্বাস লও হে সুন্দরবন..."

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছি। মাটিতে এখন অসংখ্য খুরের দাগ। এদিকে নিশ্চয়ই হরিণেরা ঘুরতে আসে। গত কয়েকদিন সুন্দরবনে যে প্রাণীটা অনেকবার দেখেছি সেটা হচ্ছে হরিণ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, পল্টনের বিশাল জনসভায় সব মানুষ একসাথে হাততালি দিলে যেরকম শব্দ শোনা যাবে, শব্দটা অনেকটা সেরকম। শব্দটা কোথা থেকে আসছে বোঝার জন্যে আমরা তাকিয়ে দেখতে পেলাম বিশাল একটা হরিণের পাল ছুটে আসছে আর মাটিতে তাদের পায়ের আঘাত থেকে এরকম শব্দ বের হচ্ছে। আমাদের দেখে হরিণগুলো পাছে ভয় পেয়ে যায় তাই আমরা তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

দেখতে দেখতে বিশাল হরিণের বাহিনী আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেগুলো মাথা তুলে সতর্কভাবে এদিক-সেদিক তাকায়, তারপর মাথা নিচু করে ঘাসপাতা খেতে থাকে। কাজল ফিসফিস করে বলল, "মানুষ হরিণের মাংস খায় না?"

আমি মাথা নাড়লাম। তখন কাজল বলল, "একটা হরিণ শিকার করলে কেমন হয়? তাহলে হরিণের মাংস খাওয়া যাবে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে খাবি?"

কাজল জিবে লোল টেনে বলল, "পুড়িয়ে। কাবাব বানিয়ে।"

কাসেমেরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, সেও বলল, "হ্যাঁ। হরিণের মাংস খুব সুস্বাদু।"

আমি বললাম, "হরিণ শিকার করবি কী দিয়ে?"

কাজল হাতের লাঠি, লাঠির আগায় চাকু দেখিয়ে বলল, "কেন এই বর্শা দিয়ে।"

"বর্শা দিয়ে?"

'হ্যাঁ। সিনেমায় দেখিস নি?"

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমরা সিনেমায় দেখেছি জংলি মানুষ বর্শা দিয়ে পশুপাখি শিকার করছে। তাই বলে আমরা? এখন? এই হাতে তৈরি বর্শা দিয়ে?

তারেক বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। চেষ্টা করে ডেখলে হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে চেষ্টা করবি?"

তারেক হাতের বর্শা দেখিয়ে বলল, "ছুড়ে মারি?"

জয়ন্ত বলল, "ঠিক আছে।"

তারেক ফিসফিস করে বলল, "ওয়ান টু থ্রি—" সাথে সাথে আমরা গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে হরিণগুলোর দিকে আমাদের বর্শাগুলো ছুড়ে দিলাম। সাথে সাথে শক্ত মাটিতে খুরের শব্দ তুলে হাজার হাজার হরিণ ছুটতে লাগল। হরিণের দৌড়ের ভঙ্গিটি কী সুন্দর! দেখে মনে হয় বুঝি সাগরের ঢেউ বইছে! তার মাঝে আমাদের পাঁচ জনের পাঁচটা বর্শা গিয়ে পড়ল—কোনো হরিণের গায়ে লেগেছে কি না বুঝতে পারলাম না কিন্তু একেবারে ছোট ন্যাদা ন্যাদা একটা বাচ্চা আমাদের লাঠিতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমরা

চিৎকার করে সেদিকে ছুটে গেলাম। হরিণের দল তাদের খুরের শব্দ তুলে মুহূর্তের মাঝে ধুলা উড়িয়ে উড়ে গেল। হরিণের বাচ্চাটা একেবারেই ছোট, মনে হয় মাত্র জন্ম হয়েছে। দৌড়ানো দূরে থাকুক ভালো করে মনে হয় দাঁড়াতেই শিখে নি। আমরা যখন সেটার দিকে ছুটে গেলাম তখন হরিণের বাচ্চাটা কোনোভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সবার আগে কাশেম আর তার পিছু পিছু আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে হরিণের বাচ্চাটাকে ধরে ফেললাম।

কাজল চিৎকার করে বলল, "ধরেছি। ধরে ফেলেছি!"

কাসেম বলল, "জ্বালাও আগুন। বানাও রোস্ট!"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "বানাও রোস্ট!"

হরিণের ছোট বাচ্চাটা তিরতির করে নড়ছে—তার বড় বড় চোখ দুটোতে ভয়ের চিহ্ন দেখে মোটেও এটাকে রোস্ট বা কাবাবের মতো মনে হচ্ছে না। কিন্তু তাতেও আমাদের উৎসাহ এতটুকু কমল না। জয়ন্ত বলল, "তোরা চামড়া ছিলতে পারবি?"

কাজল উৎসাহে হাত নেড়ে বলল, "একশবার!"

"আগে কখনো ছিলেছিস?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "ছিলি নাই, তাতে কী হয়েছে? এখন ছিলব।"

আমরা সাবধানে হরিণটাকে ধরে রাখি। কাজল শক্ত করে সামনের দুটি এবং পিছনের দুটি পা ধরে চ্যাংদোলা করে উপরে তুলে নিল—তাকে দেখে মনে হল আস্ত হরিণের বাচ্চাটা সে একবারেই খেয়ে ফেলবে।

আমরা বর্শাগুলো হাতে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম, একটু আগে এখানে হাজার হাজার হরিণ ছিল, এখন আর একটিও নেই। সবগুলো মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাসেমের কোলে হরিণের বাচ্চাটা ছটফট করছে কিন্তু তার শক্ত হাত থেকে ছুটে যাবার সাধ্যি নেই।

আমরা মাত্র কয়েক পা গিয়েছি তখন হঠাৎ জয়ন্ত বলল, "দ্যাখ দ্যাখ—"

আমরা মাথা ঘুরিয়ে বললাম, "কী?"

"একটা হরিণ!"

"কোথায়?"

"ঐ-যে!"

আমরা একটু আগে হাজার হাজার হরিণকে দেখেছি—এখন একটা হরিণ এমন কিছু দেখার জিনিস নয়, তারপরেও মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। একটু দূরে একটা গাছের আড়াল থেকে একটা হরিণ আমাদের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে আছে। আমরা একটু এগুলে হরিণটাও আমাদের পিছু পিছু আসে। সেটার চোখে-মুখে এক ধরনের উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

আমরা প্রায় একসাথে সবাই বুঝতে পারলাম এই হরিণটা হচ্ছে আমাদের ধরে ফেলা বাচ্চাটির মা! তার বাচ্চাকে ধরে ফেলেছি বলে আমাদের পিছু পিছু আসছে।

হঠাৎ করে রোস্ট বানিয়ে এই হরিণের বাচ্চাটাকে খাওয়ার পুরো ভাবনাটাকে আমাদের একেবারে ভয়ঙ্কর রকম বেকুবি বলে মনে হতে থাকে। আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলাম। কাসেম বাচ্চাটাকে নিচে নামিয়ে বলে, "যা বেটা! তোর আম্মুর কাছে যা।"

আমি বললাম, "দাঁড়া আগেই ছাড়িস না, একটু আদর করে দিই।"

তখন আমরা সবাই হরিণের বাচ্চাটাকে আদর করে দিলাম—বাচ্চাটা অবশ্য আদরটা ঠিক বুঝতে পারল না, মনে হল বুঝি আরো ভয় পেয়ে গেল! আমরা শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলাম, সাথে সাথে সেটা তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে তার মায়ের দিকে ছুটতে লাগল, তার মা-টাও ছুটে এসে তার বাচ্চাটাকে মুখ দিয়ে আদর করল। তারপর মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকাল। আমার স্পষ্ট মনে হল আমাদের বলল, "থ্যাংক ইউ!"

তারেক হরিণটাকে উদ্দেশ করে বলল, "টোমার কোনো ভয় নাই বেবি!"

জয়ন্ত বলল, "আসলে কি তোমার বাচ্চাকে আমরা খেতাম নাকি? এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম। ঠাট্টাও বোঝ না?"

আমাদের স্পষ্ট মনে হল হরিণটা আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর তার দলের অন্য সব হরিণের দিকে ছুটতে লাগল, পিছু পিছু হরিণের বাচ্চাটি ছুটতে থাকে। দৃশ্যটি যে কী সুন্দর সেটি না দেখলে বোঝানো যাবে না।

আমরা সেদিকে তাকিয়ে সবাই প্রায় একসাথে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললাম। কাসেম নিশ্বাস ফেলে ঘুরে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "খিদে পেয়েছে।"

আমরা সবাই তখন টের পেলাম আসলে আমাদের সবারই খিদে পেয়েছে। খাবার বলতে বিস্কুট এবং চিপস এবং জুস। এই খাবার খেয়ে আমাদের তিন দিন কাটাতে হবে। কাজেই খুব সাবধানে খাবার ভাগাভাগি করা হল। কাসেম তার ভাগের খাবার দেখে মুখ শুকনো করে বলল, "মাত্র এইটুকুন?"

তখন তার জন্যে আরো একটু খাবার দেওয়া হল কিন্তু সেটা দেখেও তার মুখ সেরকম শুকনোই থেকে গেল। এই কয়দিন একসাথে থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের শরীর হচ্ছে বেবিট্যাক্সির মতো—আর কাসেমের শরীর হচ্ছে রেল ইঞ্জিনের মতো। আমাদের চলতে-ফিরতে একটু খাবার হলেই হয়, কাসেমের লাগে অনেক খাবার। অনেক অনেক খাবার!

আমাদের অল্প একটু খাবারই আমরা অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে খেলাম। জুসের একটা প্যাকেট ভাগাভাগি করে খেতে হল, একজন খাবার সময় অন্য জন লক্ষ রাখল সে যেন বেশি বড় একটা চুমুক দিয়ে না দেয়। খাওয়া শেষ হবার পর খিদে কমার বদলে খিদে যেন আরো বেড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি মনমরা দেখাল কাসেমকে।

আমি বললাম, "বনে-জঙ্গলে নানা রকম ফলের গাছ থাকে। আয় খুঁজে দেখি কিছু একটা পাওয়া যায় কি না।"

কাসেম বলল, "কোথায় খুঁজবি?"

আমি বললাম, "এই তো এদিকে-সেদিকে।"

তখন সবাই মিলে আমরা এদিকে-সেদিকে খুঁজতে শুরু করলাম। কী খোঁজ করছি সেটাই যদি না জানি তা হলে খোঁজা খুব মুশকিল। কাজল তার লম্বা লাঠিটা দিয়ে ঝোপঝাড় খোঁচাতে খোঁচাতে একটা খালের দিকে নেমে গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের নিচে যেন সুস্বাদু ফলমূল লুকিয়ে আছে।

তারেকের কী মনে হল কে জানে! সে হঠাৎ করে তার ক্যামেরাটা বের করে আমাদের ছবি তুলতে লাগল। আমি বললাম, "কী করছিস?"

"ফটো টুলে রাখি।"

"কেন?"

"ডেখিস পরে ডেখটে কটো মজা হবে।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সত্যিই কি আমরা এই পোড়া জায়গা থেকে মুক্তি পাব? সত্যিই কি একসময় ছবিগুলো দেখে খুব মজা হবে?

ঠিক এই সময় আমরা কাজলের বিকট একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। সে ফলমূল খুঁজতে খুঁজতে খালের দিকে নেমে গেছে—এখান থেকে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না শুধু চিৎকার শুনছি। এক সেকেন্ড পর তাকে দেখতে পেলাম, ভয়ে-আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, সে প্রাণপণে ছুটে আসছে। কী দেখে সে ভয় পেয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না—কিন্তু মনে হল তার পিছনে ঝোপঝাড়ে একটা ঝটপটের মতো শব্দ শোনা গেল। আমরাও একটা দৌড় দেব কি না বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু ঠিক তখন কী দেখে কাজল ভয় পেয়েছে সেই প্রাণীটিকে দেখতে পেলাম এবং ভয়ে-আতঙ্কে আমাদেরও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

একেবারে আমাদের সমান উঁচু একটা সরীসৃপ ছুটে আসছে—লম্বা গলা, বড় মুখ, ধারালো দাঁত এবং দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঠিক সাপের মতো জিব বের হয়ে আছে। প্রাণীটার গায়ের রং একটু ছাইয়ের মতো—শক্ত শরীর এবং লম্বা লেজ। সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা কাজলকে ধাওয়া করেছে আর কাজল প্রাণ নিয়ে ছুটছে। আমি টেলিভিশনে এই প্রাণীগুলোকে দেখেছিলাম—এর নাম কোমাডো ড্রাগন, এগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরীসৃপ, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সরীসৃপ। দেখে মনে হয় বুঝি ডাইনোসর।

কোমাডো ড্রাগনটা তার চারপায়ে একেবারে গুলির মতো ছুটে এসে কাজলের পায়ে কামড়ে ধরল। কাজল একটা চিৎকার করে নিচে পড়ে যায়—আর আমরা দেখলাম কোমাডো ড্রাগনটা কামড়ে কাজলের পা-টা আলগা করে নেবার চেষ্টা করছে।

সবচেয়ে আগে ছুটে গেল জয়ন্ত, তারপর গেলাম আমি। আমাদের লাঠি দিয়ে আমরা কোমাডো ড্রাগনটাকে ঘা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। ড্রাগন আর কাজল হুটোপুটি খাচ্ছে তার ভেতরে আমরা ড্রাগনটাকে ঠিকমতো মারতেও পারছি না। ঠিক তখন কাসেম ছুটে এল—তার হাতের ধাক্কায় আমি আর জয়ন্ত প্রায় ছিটকে পড়লাম। সে খালি হাতে ড্রাগনটার মুখ দুই পাশে ধরে টেনে ধরার চেষ্টা করল, কাসেমের গায়ের জোর কোমাডো ড্রাগন থেকেও বেশি—সত্যি সত্যি সে মুখটা আলগা করে ফেলল, কাজল কোনোভাবে তার পা বের করে নিয়ে গড়িয়ে সরে যায়—তারপর কোমাডো ড্রাগনের সাথে কাসেমের সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার অবস্থা। কোমাডো ড্রাগনটা হিংস্র একরকম শব্দ করে কাসেমের ওপর লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, কাসেম বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়ে প্রায় আকাশে উড়ে ড্রাগনটার মাথায় একটা লাথি মেরে বসে। আমি আর জয়ন্তও তখন কাসেমের পাশে দাঁড়িয়েছি। কাসেম তার লাঠিটা নিয়ে কোমাডো ড্রাগনটার দিকে ছুটে সেটাকে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করল। কোমাডো ড্রাগনের শক্ত আর পিচ্ছিল শরীরে সেটা পিছলে যায়। আমরা তিন জন একসাথে—সাহস অনেকটা বেড়েছে, একসাথে আমরা সেটাকে ঘা দিতে থাকি—

হঠাৎ কোমাডো ড্রাগনটা মাথা নিচু করে ঘুরে গেল তারপর যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবে চারপায়ে ছুটে গিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা এবারে ঘুরে কাজলের দিকে তাকালাম, সে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে, তারেক তাকে ধরে রেখেছে।

কোমাডো ড্রাগনটা আবার না দলবল নিয়ে ফিরে আসে সে জন্যে আমরা একটু পরপর খালের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারেক কাজলের প্যান্টটা ভাঁজ করে একটু উপরে তোলে— আমরা ভেবেছিলাম দেখব কাজলের পা'টা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম সেরকম কিছু হয় নি। একটু আঁচড়ের দাগ, জায়গায় জায়গায় চামড়া উঠে গেছে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোমাডো ড্রাগন ঠিকভাবে কামড়টা দিতে পারে নি—মনে হয় কামড় দিয়ে জুতোটা ধরেছিল। কাজলের কতটুকু ব্যথা লেগেছে আমরা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু তার যতটুকু ব্যথা লেগেছে ভয় পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি। সারা শরীর থরথর করে এখনো কাঁপছে।

আমি বললাম, "কাজল, তোর কোনো ভয় নাই। কোমাডো ড্রাগনকে ভাগিয়ে দিয়েছি।"

সবাই আমার দিকে তাকাল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কী ড্রাগন?"

"কোমাডো ড্রাগন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির প্রোগ্রামে একবার দেখেছিলাম— পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরীসৃপ। ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায়।"

"ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ।"

'তা হলে এখানে কোথা থেকে এল?"

"জানি না, এসেছে হয়তো কোনোভাবে।"

কাজল উঠে বসে বলল, "এইগুলো মানুষ খায়?"

"পেলে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে। এমনিতে মাংসভোজী।"

তারেক কাজলকে জিজ্ঞেস করল, "টোমার এখন কী অবসঠা?"

কাজল তার পা'টা একটু নাড়িয়ে ককিয়ে উঠল, বলল, "পা'টা মনে হয় ভেঙে গেছে।"

তারেক মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহুঁ ভাঙে নাই। আবার নাড়াও।"

কাজল আবার নাড়াল, এবার আমরা বুঝতে পারলাম, আসলে ভাঙে নি। মচকে যেতে পারে। তারেক তার ব্যাকপেক খুলে সেখান থেকে ফার্স্টএইড বক্স বের করল, তুলো দিয়ে ভিজিয়ে এন্টিসেপটিক দিয়ে পায়ের কাটাছেঁড়াগুলো মুছে দিয়ে সেখানে টেপ লাগিয়ে দিল। এত কষ্ট করে আনা ফার্স্টএইড বক্সটা এই প্রথমবার একটা কাজে লাগল বলে মনে হয় তারেকের খুব আনন্দ হচ্ছে। এরপর আমরা কাজলকে টেনে সোজা করে দাঁড়া করালাম— ধরে ধরে কয়েকবার হাঁটালাম, তখন মনে হল তার আঘাত সেরকম গুরুতর না। হাঁটতে পারছে, নড়াচড়া করছে। খুব কপাল ভালো কোমাডো ড্রাগনটা কাজলের পা কামড়ে ধরতে গিয়ে জুতো কামড়ে ধরেছিল। জুতো মোজা ফুটো করে কোমাডো ড্রাগনের দাঁত তার পা পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

এরপর আমরা কাসেমের দিকে তাকালাম, সে একেবারে খালি হাতে ড্রাগনটার সাথে যুদ্ধ করেছে। তার কী অবস্থা কে জানে। শার্টটা ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়, শরীরের কয়েক জায়গা কেটে ছিড়ে গেছে কিন্তু তার পাথরের মতো শরীরে সে মনে হয় সেটা টেরও পায় নি। আমরা সবাই মিলে তার কেটে যাওয়া জায়গা মুছে সেখানে এন্টিসেপটিক লাগিয়ে দিলাম।

কাজল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে তার ব্যাকপেকটা কাঁধে নিয়ে বলল, "আয়, এই জায়গা থেকে ভাগি।"

"হ্যাঁ। আমি বললাম কোন সময় আবার কোমাডো ড্রাগন এসে যাবে।"

জয়ন্ত বলল, "নামটা ঠিকই দিয়েছে। কোমাডো ড্রাগন। একেবারে আসল ড্রাগন।"

তারেক হাঁটতে হাঁটতে বলল, "কটো বড়। বাবারে বাবা।"

কাজল বলল, "তোরা যদি আমাকে না বাঁচাতি এতক্ষণে মনে হয় আমাকে খেয়ে ফেলত।"

কাসেম নাক দিয়ে ঘ্রোত করে শব্দ করে বলল, "খেয়ে ফেলা এত সোজা! আসুক না আবার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।"

আমি কাসেমের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই পারবি!"

জয়ন্ত হঠাৎ তারেকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা তারেক, তুই কোথায় ছিলি?"

"কখন?"

"আমরা যখন ড্রাগনের সাথে যুদ্ধ করছিলাম তখন তুই কী করছিলি?"

তারেক মুচকি হাসল, বলল, "ফটো টুলছিলাম।"

জয়ন্ত চোখ কপালে তুলে বলল, "ফটো তুলছিলি?"

"হ্যাঁ। ঠিক সেই সময় আমি ক্যামেরাটা হাটে নিয়েছি টোডের ফটো টোলার জন্যে আর টখন এই ঘটনা। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ছবি টুলেছি!"

"আমাদের এই অবস্থা! আর তুই ফটো তুলেছিস?"

তারেক দাঁত বের করে হেসে বলল, "ডেখলাম টোরা আমাকে ছাড়াই ভালো ফাইট দিচ্ছিস! টাই—"

আমাদের এরকম অবস্থায় সে ফটো তুলেছে শুনে আমরা রাগ হব কিনা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সত্যিই যদি সে ঠিক ঠিকভাবে সেই সময় ফটো তুলে থাকে তা হলে সেই ফটোগুলো নিশ্চয়ই হবে অসাধারণ ফটো!

তারেক তার গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা নিয়ে সেটাকে চুমু খেয়ে বলল, "এই ক্যামেরার ভিটরে আছে মিলিয়ন ডলার ফটো! না ডেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না!"

আমরা মাথা নাড়লাম, তারেক ঠিকই বলেছে, এই ফটোগুলো যদি ঠিকভাবে আসে তা হলে আসলেই হবে মিলিয়ন ডলার ফটো।

আমরা হেঁটে হেঁটে আবার নদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। নদীটা সামনে গিয়ে বাঁক নিয়ে গেছে তাই খুব বেশি দূর দেখা যায় না। তবুও আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম যে হয়তো হঠাৎ দেখব একটা নৌকা কিংবা একটা ট্রলার যাচ্ছে, আমরা তখন হাত নেড়ে চিৎকার করব তখন তারা এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। আমরা বসে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিন্তু কোনো নৌকা করে কেউ আমাদের উদ্ধার করতে এল না।

বিকেল হয়ে এসেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। এখনই বেশ ঠাণ্ডা, আরেকটু পরে নিশ্চয়ই কনকনে শীতে আমরা কাঁপতে থাকব। ব্যাকপেক বের করে আমাদের যতগুলো কাপড় ছিল সবগুলো একটার ওপর আরেকটা পরে নিলাম।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "আমরা রাত্রে কোনখানে ঘুমাব?"

আমি বললাম, "একটা বড় আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে বসে থাকব। ঘুমানোর চিন্তা করিস না।"

কাজল এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "আবার যদি কোমাডো ড্রাগন আসে?"

"আগুন দেখলে আসবে না।"

কাজল মুখ বাঁকা করে বলল, "তোকে বলেছে! আগুনে আরো অনেক দূর থেকে দেখা যাবে—আরো দূর থেকে কোমাডো ড্রাগনের দলবল নিয়ে আসবে।"

"ধুর গাধা!" আমি বললাম, "সব জন্তু-জানোয়ার আগুনকে ভয় পায়।"

কাজল আবার মুখ বাঁকা করে বলল, "সব জন্তু-জানোয়ার তো তোর শালা-সম্বুন্ধী—তাই তোকে এসে বলে গেছে।"

আমি রেগে বললাম, "দুনিয়ার সবাই জানে—"

"জানলে জানুক।" কাজল মাথা তুলে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি গাছের ওপর ঘুমাব।"

"তুই কি বানর নাকি যে গাছের ওপর ঘুমাবি? ঘুমের মাঝে যদি নিচে পড়িস একেবারে ভর্তা হয়ে যাবি।"

"হলে হব" বলে সত্যি সত্যি কাজল গাছ বাছাই করা শুরু করে দিল।

তারেক মাথা নেড়ে বলল, "কোমাডো ড্রাগনের কামড় খেয়ে ভয় পেয়েছে টো—"

কাজল চোখ পাকিয়ে বলল, "তোরা কামড় খেলে দেখতাম তোরা কী করিস!"

জয়ন্ত বলল, "ঠিক আছে, আয় সবাই গাছের ওপর রাত কাটিয়ে দিই। একটা রাতই তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

কাসেম বলল, "ভালো দেখে একটা গাছ খুঁজে বের কর।"

ভালো দেখে গাছ খুঁজে বের করা খুব সহজ ব্যাপার হল না। শেষ পর্যন্ত যখন একটা মোটাসোটা ঝাপড়া গাছ পাওয়া গেল তখন বনে রীতিমতো অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরা এবার খামচাখামচি করে গাছে উঠে পড়লাম। কাজটা যে খুব সহজ হল তা না, কাসেম আমাদের ঠেলে তুলে দিল বলে রক্ষা। তার নিজের উঠতে খুব কষ্ট হল, কোমাডো ড্রাগনের সাথে যুদ্ধ করে তার যত জায়গা কেটে গিয়েছিল হাঁচড়পাঁচড় করে গাছে উঠতে গিয়ে তার শরীরের আরো বেশি জায়গা কেটে গেল, আরো বেশি শরীরের ছাল-চামড়া উঠে গেল। তবে তার পাথরের মতো শরীর সেটা টের পায় না এটাই রক্ষা। বড় গাছটার নানা জায়গায় আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছি, সবাই পাশাপাশি গাদাগাদি করে বসতে পারলে শীতটা একটু কম লাগত কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

আমি বললাম, "সাবধান, কেউ ঘুমাবি না।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী হবে ঘুমালে?"

"গাছ থেকে পড়ে যাবি।"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "দড়ি থাকলে আমরা গাছের সাথে নিজেকে বেঁধে রাখতাম!"

কাজল বলল, "কাছে যদি কোনো একটা দোকান থাকত—আর আমরা দড়ি কিনে আনতে পারতাম, তা হলে কী মজা হত!"

কাসেম বলল, "শুধু দড়ি কেন? তা হলে মোটা মোটা দুইটা বার্গার কিনে আনতাম!"

জয়ন্ত বলল, "আর গরম চা এক মগ।"

আমি হি হি করে হেসে বললাম, "আরে গাধা যদি একটা দোকান থাকত তা হলে আমাদের এই গাছের ডালে রাত কাটাতে হত না। আমরা আরামে বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে পারতাম।"

আমাদের সবারই তখন একসাথে আমাদের জাহাজের কথা মনে পড়ল, আমরা সবাই রাত্রিবেলা কী মজা করেই না আমাদের স্লিপিং ব্যাগে ঘুমাতাম! কেউ যদি আমাদেরকে এখন জাহাজের ডেকে আমাদের স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে নিয়ে শুইয়ে দিতে পারত তা হলে মনে হয় আমরা সারা জীবনের জন্যে তার গোলাম হয়ে যেতাম! গোলাম না হলেও চামচা তো অবশ্যই হতাম! আমরা সবাই তখন ছোট-বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

জয়ন্ত শরীর চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এতদিন গোসল নাই, শরীরে মনে হয় চুলকানি হয়েছে।"

কাজল বলল, "আমার শরীরের এখানে-সেখানে মনে হয় ফোড়া উঠেছে।"

আমি বললাম, "ফোড়া খুব ভয়ঙ্কর জিনিস।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, ইবু তোর জানি কোথায় ফোড়া উঠেছিল?"

কী বিপদ? এত কষ্ট করে আমার অসুবিধের জায়গায় ফোড়ার কথা সবার কাছে গোপন রেখেছি এখন এই সুন্দরবনে গাছের ওপরে রাত কাটানোর সময় সেই কাহিনী সবাইকে বলতে হবে?

ঠিক তখন তারেক "আউ" করে চিৎকার করে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"কী যেন একটা শরীরের ওপর ডিয়ে হেঁটে গেল।"

"টর্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখ।"

"ভয় করে।"

"কীসের ভয়?"

"যডি দেখি মাকড়সা—"

"তা হলে কী হবে?"

তারেক ভাঙা গলায় বলল, "মাকড়সাকে আমার খুব ভয় করে।"

কাজল বলল, "আরে ধুর! মাকড়সাকে ভয় পাওয়ার কী আছে? দেখতে কী সুন্দর! আটটা পা যখন ছড়িয়ে রাখে দেখতে একেবারে ফুলের মতো মনে হয়।"

তারেক রেগে উঠে বলল, "মাকড়সাকে টোর কাছে ফুলের মটো মনে হয়? টোর মাঠায় নিশ্চয়ই গোলমাল আছে।"

কাজল বলল, "মাকড়সাকে আমার একেবারেই ভয় লাগে না। তবে হ্যাঁ, জোঁককে আমার খুব ভয় লাগে।" শিউরে উঠে বলল, "উহ! বাবা!"

জয়ন্ত বলল, 'জোঁককে ভয় পাওয়ার কী আছে? কী সুন্দর পিলপিল করে যায়! আমরা যখন বর্ষাকালে কাকাবাড়ি যাই—"

কাজল বলল, "বলিস না, বলিস না, প্লিজ তোর পায়ে ধরি।"

জয়ন্ত তবু বলতেই লাগল, "বাসায় এসে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে ঝুরঝুর করে জোঁকের বাচ্চা বের হতে থাকে।"

কাসেম অন্ধকারে কোনো এক জায়গা থেকে থ্রোত করে শব্দ করে বলল, "মিথ্যুক!"

গল্পগুজব করে করে যখন মনে হল রাতটা প্রায় পার করে দিয়েছি তখন আমি ঘড়িতে দেখি মাত্র রাত আটটা বাজে। আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না, ভাবলাম নিশ্চয়ই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ঘড়ি চলছে—তবুও বিশ্বাস হল না। অবাক হয়ে বললাম, "মাত্র আটটা বেজেছে! এটা কি হতে পারে?"

সবাই নিজের ঘড়ি দেখে বলল, আসলেই রাত আটটা বাজে। অথচ মনে হচ্ছে এখানে বুঝি নিশুতি রাত। গাছের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছি, কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ করে কোনো একটা পাখি উড়ে যায়। গাছের ডালে বা পাতায় কিছু একটা ঝটপট করে ওঠে আর আমরা চমকে উঠি, ভয়ে ভয়ে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা করি জিনিসটা কী—বেশিরভাগ সময়ই কিছু দেখি না। নিচে দিয়ে বন্য পশুর আনাগোনা টের পাই, কিছু বোঝার আগে ছুটে পালিয়ে যায়। সন্ধেবেলায় মশা খুব উৎপাত করেছে, আমরা অবিশ্যি হাত পা নাক মুখ সবকিছু ঢেকে বসেছি, মশার বসার জায়গা নেই। তবে শরীরের নানা জায়গায় চুলকাচ্ছে—কারণটা কী বুঝতে পারলাম না। শুনতে পেলাম কাসেম খসখস করে কোনো একটা জায়গা চুলকাতে চুলকাতে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "খিদে পেয়েছে।"

আমাদের সবারই খিদে পেয়েছে, কথাটা বলি বলি করে বলছিলাম না। এখানে তিন দিন থাকতে হবে প্রথম দিনই যদি সব খাবার শেষ করে ফেলি তা হলে পরের দুই দিন কী খেয়ে থাকব? কিন্তু খিদের কথা বলা মাত্রই সবার পেটে মোচড় দিয়ে ওঠে।

জয়ন্ত বলল, "আয় সবাই দুইটা করে বিস্কুট খেয়ে নিই।"

কাসেম ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মাত্র দুইটা?"

জয়ন্ত বলল, "দুইটাই বেশি।"

আমি বললাম, "কাসেমকে তিনটা দিস। মনে নাই আজকে সে কাজলের জন্যে কোমাডো ড্রাগনের সাথে কী একটা ফাইট দিয়েছে!"

তারেক বলল, "টা হলে টো কাজলেরই টার ভাগটা কাসেমকে ডেওয়া উচিট!"

কাজল বলল, "কিন্তু ইয়ে—আ—আমারও যে খুব খিদে পেয়েছে!"

ঠিক কী কারণ জানি না কাজলের কথা শুনে আমরা আবার হি হি করে হেসে উঠি।

রাতের খাবারটা ছিল মাত্র দুইটা বিস্কুট—কাসেমের জন্যে তিনটা—কিন্তু সেটাই আমরা খেলাম খুব আস্তে আস্তে। কুটুরকুটুর করে একটু একটু করে কামড় দিয়ে খাই। তার মাঝে আমার বিস্কুটের অর্ধেকটা ভেঙে নিচে পড়ে গেল—মনটা এমন খারাপ হল আর বলার নয়। সকালে উঠে খুঁজে দেখতে হবে। বিস্কুটের পর দুই ঢোক পানি। সবাই খাওয়ার পর দেখা গেল আরো খানিকটা পানি রয়ে গেছে তখন আরো এক ঢোক খাওয়া হল। খাওয়া শেষ হবার পর আমরা আবিষ্কার করলাম, আমাদের খিদে আরো বেড়ে গেছে, মনে হচ্ছে পেটের মাঝে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে!

কাজল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "যখন বাসায় ফিরে যাব তখন প্রথমেই এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলব। গরম ভাত আর ডাল। সাথে ডিমভাজি।"

জয়ন্ত বলল, "আমি খাব দুই গামলা। একেবারে ডেকচি থেকে নামিয়েই তার ওপর দুই চামুচ ঘি ঢেলে দিব। উমমম..." দৃশ্যটা কল্পনা করেই জয়ন্তের চোখ নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে আসে।

তারেক বলল, "আমি প্রঠমে একটা হ্যামবার্গার—"

কাসেম এক কোনা থেকে গর্জন করে বলল, "খবরদার, খাবার নিয়ে গল্প করবি না। খুন করে ফেলব।"

আমরা আবার হি হি করে হাসতে থাকি।

অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে যখন মনে হল রাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে তখন ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সেখানে মাত্র দশটা বাজে। বনে-জঙ্গলে গাছের ডালে রাত কাটাতে হলে মনে হয় সময় আটকে যায়। একেবারেই কাটতে চায় না। কী অবাক কাণ্ড!

সময় কাটানোর জন্যে আমরা তখন নানারকম কায়দাকানুন আবিষ্কার করতে থাকি।

জীবনের মজার ঘটনা, হাসির ঘটনা, লজ্জার ঘটনা, রাগের ঘটনা এরকম নানা জিনিস চেষ্টা করা হল কিন্তু কিছুই কাজ করল না। একটা গভীর অরণ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা ঝাপড়া গাছে বসে রাত কাটানো আসলে খুব কঠিন। আমরা সবাই ভাব দেখাচ্ছি যেন ব্যাপারটা খুব সহজ আর মজার কিন্তু ভিতরে ভিতরে টের পাচ্ছি এটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার।

আস্তে আস্তে আমাদের কথা কমে এল—একসময় কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন চুপচাপ গাছের ডালে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। কী ভয়ঙ্কর শীত, মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরটা পর্যন্ত জমে যাবে। ঘরের ভেতরে বিছানায় নরম লেপের নিচে ঘুমাতে কী মজা—এই প্রথমবার সেটা বুঝতে পারছি। রাত্রিবেলা রাস্তাঘাটে গরিব বাচ্চারা যখন এই শীতের মাঝে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে তখন তাদের নিশ্চয়ই এরকম কষ্ট হয়। বাসাতে গিয়েই আমার পুরোনো সোয়েটারটা কোনো একটা গরিব বাচ্চাকে দিয়ে দিতে হবে। অবিশ্যি যদি এখান থেকে উদ্ধার পেয়ে কোনোদিন বাসায় যেতে পারি!

মাঝরাতে হঠাৎ পুরো এলাকাটা চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। চাঁদের আলোর এই ব্যাপারটা আমি আগে কখনো লক্ষ করি নি—এটা দিয়ে সবকিছুই দেখা যায় কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না! সবকিছু এরকম আবছা আর অস্পষ্ট দেখার মাঝে একটা খুব অস্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে। ঢাকা শহরে থেকে কোনোদিন চাঁদ পর্যন্ত ঠিক করে দেখি নি। এই গভীর রাতে সুন্দরবনে জোছনার আলোতে এই পুরো জঙ্গলটাকে যে কী রহস্যময় মনে হচ্ছে সেটি আর বলার মতো নয়!

সারাটা রাত যে কী কষ্ট করে কাটিয়েছি সেটি কাউকে বোঝানো যাবে না। সবাই চেষ্টা করেছি গাছের ডালে এমন একটা জায়গা বেছে নিতে যেন হেলান দিয়ে বসা যায়, আর হঠাৎ ঘুমিয়ে গেলে যেন গাছ থেকে নিচে পড়ে না যাই। গাছের ডালে মশা আর পোকামাকড়ের কামড়, নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ, কনকনে শীত, কিছুতেই আরাম করে বসতে না পারা, ভয় আর আতঙ্ক, শরীরের নানা জায়গায় চুলকানি, খিদে এবং তৃষ্ণা এত কিছুর পরেও আমরা মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম এবং হঠাৎ করে চমকে উঠে ধড়মড় করে জেগে উঠছিলাম। সেটি যে কী কষ্ট কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।

শেষ পর্যন্ত রাত শেষ হল। খুব ধীরে ধীরে চারদিক আলো হতে থাকে। বনের ভেতরে এক ধরনের হালকা নরম একটা কুয়াশা পড়েছে—সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে সবকিছুকে রহস্যময় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা যেন সত্যিকার পৃথিবী নয়, যেন কোনো একটা স্বপ্নের দৃশ্য।

আমরা পুরোপুরি আলো না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তারপর নিচে নামার জন্যে রেডি হতে থাকি। তারেক বলল, "আমি আগে নিচে নেমে নিই, টারপর একটা একটা ব্যাগ আমার কাছে ডিও।"

গাছে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল কিন্তু নামাটা এমন কিছু কঠিন হল না—তারেক বেশ সহজেই নেমে গেল। তারেকের হাতে আমি ব্যাগগুলো ধরিয়ে দিতে লাগলাম। প্রথম ব্যাগটা দিয়ে আমি তারেককে যখন দ্বিতীয় ব্যাগটা দিচ্ছি তখন আমি দেখতে পেলাম বিশাল একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, কুয়াশার ভেতর থেকে খুব ধীরে ধীরে এদিকে হেঁটে আসছে।

আমি একবার তারেকের দিকে তাকালাম, সে এখনো দেখে নি। আমরা গতকাল বিকেলে যখন এই গাছে উঠেছি তখন আমরা কেউ নিজে নিজে গাছে উঠতে পারি নি, কাসেম ঠেলে তুলেছে। তারেক কিছুতেই এখন গাছে উঠতে পারবে না, কোথাও ছুটে পালাতে পারবে না। এখন কী হবে? আমি তারেককে চাপা গলায় বললাম, "তারেক।"

তারেক বলল, "কী?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "ভয় পাবি না। তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। একটুও নড়বি না। খবরদার।"

তারেক জিজ্ঞেস করল, "কেন?" তারপর মাথা ঘোরাল আর নিজের চোখে রয়েল বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখতে পেল। সাথে সাথে তারেকের পুরো শরীর পাথরের মতো জমে গেল।

তারেক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি দেখলাম রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা খুব ধীরে ধীরে তারেকের দিকে হেঁটে আসছে। কী বিশাল একটা বাঘ, আমি হতবাক হয়ে দেখি। ভয়ঙ্কর জিনিসের যে একটা সৌন্দর্য থাকতে পারে এই প্রথম আমি সেটা টের পেলাম। এই সৌন্দর্য অন্য দশটা জিনিসের সৌন্দর্য থেকে ভিন্ন। আমি সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "হে খোদা! তুমি রক্ষা কর। প্লিজ খোদা তুমি রক্ষা কর! তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার কাছে আমি আর কোনোদিন কিছু চাইব না। তারেককে তুমি বাঁচিয়ে দাও। প্লিজ খোদা—তারেকের যেন কিছু না হয়।"

আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম খুব ধীরে ধীরে রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা তারেকের দিকে এগিয়ে আসছে। এত বড় একটা প্রাণী কিন্তু তার পায়ের এতটুকু শব্দ নেই। আসছে একেবারে নিঃশব্দে। তারেকের খুব কাছে এসে রয়েল বেঙ্গল টাইগারটি দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তার মাথাটা উঁচু করে তারেকের মুখের কাছাকাছি নিয়ে এসে তাকে একবার শুঁকে। তারপর মাথাটা নিচু করে তার শরীরটা একবার শুঁকে। তারপর সেটা আবার মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হঠাৎ গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ করল। কোনো ক্রুদ্ধ গর্জন নয়, অনেকটা বিরক্তি প্রকাশ করার মতো। যেন বলছে তোমরা ছেলে-ছোকরারা এখানে কেন?

তারপর রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা যেদিকে হাঁটছিল ঠিক সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। যেন কিছু হয় নি। তার রাজকীয় এই ভঙ্গিটা দেখে মনে হয় সে খুব ভালো করে জানে এই পুরো এলাকাটা তার। এখানে কেউ যদি আসে তাকে সে দয়া করে এখানে থাকতে দেয়।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা একটু সরে যেতেই তারেক এক পা পিছিয়ে আসে তারপর কেমন যেন অবসন্নের মতো গাছের গুঁড়িটাতে বসে পড়ে। দেখে মনে হয় হঠাৎ করে তার পায়ে বুঝি কোনো জোর নেই। আমি তারেকের মুখের দিকে তাকালাম, তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে, চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে।

বাঘটা এখনো খুব কাছাকাছিই আছে কিন্তু আমি তবুও গাছ থেকে নেমে এসে তারেককে ধরলাম। তারেকও আমার হাত ধরে কেমন যেন চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "ভয় পেয়েছিলি?"

তারেক মাথা নাড়ল, তারপর হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি দুই হাতে তারেককে ধরে বললাম, "কাঁদিস না তারেক। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।"

তারেক বিড়বিড় করে ইংরেজিতে বলল, "আমার আব্বু গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। মারা যাবার সময় আমার আম্মুর হাত ধরে বলেছেন আমাকে যেন নিজের দেশটা দেখান। সে জন্যে আমি বাংলাদেশে এসেছি! এখন আমি যদি মরে যাই তা হলে আম্মুর কী হবে?"

"তুই মরবি না তারেক। তুই মরবি না।"

তারেক আবার ইংরেজিতে বলল, "যদি রয়েল বেঙ্গল টাইগারটা আমাদের আক্রমণ করত?"

"করত না। বাঘটা গতকাল সারাক্ষণই আমাদের দেখেছে, আমরা তাকে বিরক্ত করি নাই, সেও আমাদের বিরক্ত করে নাই। আমরা তার এলাকায় আছি—সব বাঘের একটা এলাকা থাকে।"

"কিন্তু যদি করত?" এখনো সে ইংরেজিতে বলছে, "যদি একটা থাবা দিত?"

"দিত না।" আমি তারেককে ধরে বললাম, "বাঘ মানুষের মতো না। কোনো কারণ ছাড়া বাঘ কোনোদিন কাউকে মারে না। শুধু মানুষখেকো বাঘ মানুষ মারে। জিম করবেটের বই পড়িস নি? সে যখন ছোট ছিল তখন একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত? আগুন জ্বালিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে থাকত—বাঘ তার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেত—পড়িস নি?"

তারেক চোখ মুছে এবারে বাংলায় বলল, "যডি কিছু একটা হটো?"

আবার বাংলায় তার নিজস্ব উচ্চারণে কথা বলতে শুরু করেছে—তার মানে একটু স্বাভাবিক হয়েছে। আমি তার দুই কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "আমরা সবাই এখানে একসাথে আছি, যা হবার সবার একসাথে হবে।"

ততক্ষণে অন্যরাও নেমে এসেছে। সবাই তারেককে ঘিরে বসেছি। তারাও আমার সাথে সাথে মাথা নাড়ল। জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ। আমরা একসাথে থাকলে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। দেখিস।"

কাজল খানিকক্ষণ জুলজুল করে তারেকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোর অনেক সাহস। আমি তোর জায়গায় থাকলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেই বাথরুম হয়ে যেত।"

আমরা সবাই চেষ্টা করছি হালকা কথা বলে পরিবেশটা হালকা করার জন্যে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "কোনটা? ছোটটা না বড়টা?"

"দুইটাই।"

তারেক বলল, "কেমন করে হবে? কিছু না খেলে বাথরুম হবে কেমন করে?"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ, লক্ষ করেছিস? আমাদের পেশাব দেখতে এখন রঙ-চায়ের মতো?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, জয়ন্ত ঠিকই বলেছে। পানি না খাওয়ার জন্যে এই অবস্থা। জয়ন্ত কবি মানুষ বলে এত সুন্দর উপমা খুঁজে বের করতে পারে, আমরা পারি না। কবি জাকারিয়া শামস থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের পেশাবের এর থেকে সুন্দর উপমা দিতে পারতেন।

আমি বললাম, "এক কাজ করা যাক।"

কাজল জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

"প্রথমে একটা আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে নিই। তারপর—"

"তারপর কী?"

'তারপর নদীর তীর দিয়ে হাঁটা শুরু করি। এখান থেকে বের হলে যদি কোনো একটা নৌকা, না হয় লঞ্চ বা ট্রলার পেয়ে যাই—"

জয়ন্ত বলল, "এইখানে তবু একটা ফ্রেন্ডলি বাঘ আছে। ফ্রেন্ডলি বাঘের এলাকা থেকে যদি সন্ত্রাসী বাঘের এলাকায় পড়ে যাই?"

আমি বললাম, "বাঘেরা সন্ত্রাসী হয় না। সন্ত্রাসী হয় শুধু মানুষেরা।"

কাজল বলল, "বড় বড় লেকচার না দিয়ে আগে আগুন জ্বালা।"

আমি বললাম, "আগে শুকনো পাতা কাঠি লাঠি নিয়ে আয়।"

আগুন জ্বালানো কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল দেখা গেল আসলে এত সহজ না। কাজলের পুরো ডিটেকটিভ বই আর জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপির পুরোটা জ্বালিয়ে দেবার পর শেষ পর্যন্ত আগুন ধরল। শীতের দিনে আগুন চমৎকার একটা ব্যাপার, হাত-পা সেঁকে আমরা গরম হয়ে যেতে থাকি। সুন্দরবনের ভয়ানক অ্যাডভেঞ্চারের আরো একটা দিন শুরু হল।

যখন আমরা আবিষ্কার করলাম কোমাডো ড্রাগন কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু আমাদের কপালে আছে।

সারা রাত ঘুম হয় নি। চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। আগুনটা যখন বেশ ভালোভাবে জ্বলে উঠেছে আমরা তখন আগুনের পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লাম। পালা করে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হল আগুনটাকে চাঙ্গা রাখার জন্যে। অবিশ্যি দায়িত্ব দেওয়া পর্যন্তই, আগুনটা যখন বেশ ভালোভাবে জ্বলে উঠেছে তখন একজন একজন করে সবাই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে।

সবার আগে ঘুম ভাঙল আমার। কেন ঘুম ভেঙেছে আমি জানি না কিন্তু মনে হল কিছু একটা অস্বাভাবিক জিনিস শুনতে পেয়েছি। আমি কান পেতে থাকলাম তখন আবার সেই

শব্দটা শুনতে পেলাম, মনে হল পানিতে বৈঠা ফেলার শব্দ। নদীতে একটা নৌকা যাবার শব্দ। মুহূর্তের মাঝে আমার ঘুম পুরোপুরি ভেঙে গেল, আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। আমার সবাইকে জাগিয়ে তুলে চিৎকার শুরু করে দেওয়ার কথা। কিন্তু আমি কেন জানি হতচকিত হয়ে বসে রইলাম।

আমি এবার পানিতে বৈঠা দেওয়ার শব্দের সাথে সাথে মানুষের গলার শব্দ শুনতে পেলাম—নিশ্চিতভাবেই নৌকাতে করে মানুষ এসেছে। আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম, নদীতীরে গিয়ে নৌকাটা দেখা দরকার, আমাদের নেওয়ার জন্যে থামানো দরকার।

ঠিক এরকম সময় একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম আর সাথে সাথে কোনো একটা বুনো পশু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে গেল। আমি আবার মানুষের গলার শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হল কেউ কাউকে গালাগাল দিচ্ছে।

গুলির শব্দ শুনে সবাই তখন জেগে উঠেছে, আমি সবাইকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বললাম। কাজল ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "একটা নৌকা এসেছে। সেখান থেকে গুলির শব্দ।"

জয়ন্ত বলল, "গুলি কে করেছে?"

"জানি না।"

"ডাকাত না তো?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আমি কেমন করে বলব?"

"কাছে গিয়ে দেখা দরকার।"

"হ্যাঁ। কিন্তু খুব সাবধান। সুন্দরবনে জঙ্গলে অনেক রকম ডাকাত লুকিয়ে থাকে।" আমি ফিসফিস করে বললাম, "উল্টাপাল্টা কারো হাতে ধরা পড়লে কিন্তু আরো বিপদ হয়ে যাবে।"

"আয় কাছে থেকে লুকিয়ে দেখে আসি।"

সাথে সাথে সবাই নিজের ব্যাকপেক নিয়ে রেডি হয়ে গেল—আমি সবার দিকে একনজর দেখে বললাম, "উঁহুঁ। এই ব্যাকপেকগুলোর এত চকচকে রঙ দূর থেকে দেখে ফেলবে।"

"তা হলে?"

"ব্যাকপেকগুলো রেখে যাই। সবার যাবার দরকার নেই, আমি আর জয়ন্ত গিয়ে দেখে আসি।"

কাজল দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "আমরা কি এখানে বসে বসে আঙুল চুষব?"

আমি বললাম, 'আরে গাধা তোদের সবার গায়ের কাপড় হয় লাল না হয় নীল না হয় বেগুনি—আমার আর জয়ন্তেরটা ম্যাটমেটে।"

কাসেম কোনো কথা না বলে তার নীল জ্যাকেটটা খুলে বলল, "আমি যাব।"

কাসেম কম কথার মানুষ—কাজেই তার সাথে তর্কবিতর্ক করা সম্ভব না। তাই কাজল আর তারেককে আমাদের ব্যাকপেকগুলোর পাহারায় রেখে আমরা তিন জন পা টিপে টিপে রওনা দিলাম।

মানুষের গলার আওয়াজ লক্ষ করে নদীর কাছাকাছি এসে আমরা একটা নৌকা দেখতে পেলাম। নৌকাটা একটা খালের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। নৌকার পিছনে দুজন মানুষ। একজন

বাঁশের লগি দিয়ে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অন্যজন হাতে একটা বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষগুলোকে দেখেই বোঝা গেল এদের মাঝে কোনো একটা সমস্যা আছে। আমরা এই সুন্দরবন এলাকায় বেশ কয়েকদিন থেকে আছি, অনেক নৌকা আর নৌকার মাঝি দেখেছি। সবাই খুব সাধারণ চেহারার, লুঙ্গি পরে থাকে, শীতের জন্যে শরীরে চাদর জড়িয়ে রাখে কিন্তু এরা প্যান্ট-শার্ট পরে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরা এখানকার সাধারণ মাঝি না—এরা অন্যরকম।

আমরা শুনতে পেলাম যে লগি দিয়ে নৌকা ঠেলছে সে বলল, "আমি বললাম— নৌকা থেকে চেষ্টা করিস না—আমার কথা শুনলি না। খামোখা একটা গুলি নষ্ট।"

বন্দুক হাতে মানুষটা বলল, "ঠিক যখন গুলি করব তুই তখন লগি দিয়ে দিলি ঠেলা—"

"নৌকায় লগি দিয়ে ঠেলা না দিলে কি নৌকা চলে সম্বুন্ধির পুত?"

"মুখ খারাপ করিস না বদি। এখানে নৌকা থামা।"

বদি নামের মানুষটা বলল, "আরেকটু সামনে নিয়ে রাখি। না হলে কেউ দেখে ফেলবে।"

আমাদের সন্দেহ তা হলে সত্যি, এই মানুষগুলোর আসলেই কোনো একটা বদ উদ্দেশ্য আছে—তা না হলে নৌকাটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কেন?

নৌকাটা খাল ধরে আরো একটু ভিতরে ঢুকে গেল, আমরাও নিঃশব্দে পিছনে পিছনে যেতে থাকি—কী নিয়ে কথা বলছে শুনতে চাইছি তাই একটু কাছে থাকা দরকার। আরেকটু সামনে গিয়ে নৌকাটা খালের পাশে এসে থামাল। দুই তীর থেকে গাছ খালের উপরে চলে গিয়ে জায়গাটা ঢেকে রেখেছে, ভেতরে নৌকাটা রাখলে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই।

লোক দুটো নৌকাটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে নেমে এল। যে মানুষটার নাম বদি সে এদিক-সেদিক তাকাল তারপর বলল, "আয় কুদ্দুস। যাই।"

বন্দুক হাতে মানুষটার নাম কুদ্দুস, সে জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "কী মোটাসোটা হরিণটা পেয়েছিলাম, মারতে পারলাম না।"

বদি বলল, "এই এলাকার সব হরিণ মোটাসোটা নাদুসনুদুস। কয়টা মারতে চাস বল! তোর আর ধৈর্য নাই সেইটা হচ্ছে তোর সমস্যা।"

কুদ্দুস একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আমি তো আর এত দেখি নাই!"

"এখন এই এলাকায় এসেছিস। দেখবি। হরিণ দেখবি, হরিণের নাদা দেখবি। দেখতে দেখতে চোখ পচে যাবে।"

কুদ্দুস জিজ্ঞেস করল, "এখানে আবার বাঘ নাই তো?"

বদি বিরক্ত হয়ে বলল, "এইভাবে নাম নিতে নাই।"

"কী হয় নাম নিলে?"

"সব জায়গার একটা নিয়মনীতি আছে। এইখানকার নিয়মনীতি এইরকম। ত্যানাদের নাম নিতে হয় না। নিলে কপালে দুঃখ হতে পারে।"

কুদ্দুস ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে এরকম ভাব করে মাথা নাড়ল। তারপর দুই জন হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল।

আমরা মানুষগুলোর গলার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর পা টিপে টিপে তারেক আর কাজলের কাছে ফিরে এলাম। কাজল বলল, "কী ব্যাপার?"

আমি বললাম, "মনে হয় হরিণ মারতে এসেছে।"

"হরিণ? হরিণ মারা বেআইনি না?"

"একশ বার বেআইনি।"

"তা হলে এদের থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে!"

"মনে হয় সেইটাই ভালো। মানুষগুলোকে একেবারেই সুবিধার মনে হল না।"

কাসেম বলল, "নৌকার মাঝে কোনো খাবার আছে কি না দেখা উচিত ছিল।"

"খাবার?"

"হ্যাঁ। খাবার না হয় পানি।"

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম, কাসেম ঠিকই বলেছে। নৌকার মাঝে যদি পানি কিংবা খাবার থাকে তা হলে সেটা একটু খেয়ে আসা এমন কিছু অপরাধ হবে না। আমরা যে অবস্থায় আছি তার মাঝে না খাওয়াটাই হবে বোকামি। তারেক তবুও একটু ইতস্তত করে বলল, "যদি বুঝে ফেলে?"

"বুঝবে কেমন করে?" আমি তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "বন-জঙ্গলের ব্যাপার। ভাববে কোনো বানর এসে খেয়ে গেছে!"

জয়ন্ত আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা ঠিকই ভাববে। তাকিয়ে দেখ একজন আরেকজনকে ঠিক বানরের মতো লাগছে কি না?"

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। জয়ন্ত ভুল বলে নি—এই কয়দিনে আমাদের যা চেহারা হয়েছে সেটা বানরের থেকে কোনো অংশে কম নয়।

আমি বললাম, "তা হলে দেরি করে কাজ নেই—তাড়াতাড়ি আয়। ঐ লোকগুলো চলে এলে মহা ঝামেলা হয়ে যাবে।"

নৌকার কাছাকাছি গিয়ে আমরা একবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম যে কেউ নেই। ছোট নৌকা একসাথে সবাই উঠলে সমস্যা হতে পারে, তাই প্রথমে জয়ন্ত উঠল। নৌকার ছইটা একটা ঝাঁপ দিয়ে ঢাকা, সে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে, সাথে সাথে ভিতরে ঢিসুম করে একটা শব্দ হল। জয়ন্ত একটা চিৎকার করে উঠে তারপর ছিটকে বের হয়ে আসে, দুই হাতে নাকটা ধরে রেখেছে, চোখ উল্টে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

জয়ন্ত নাক চেপে রেখে বলল, "ঘুঁসি মেঁরেঁছে। বাঁবাঁরে! গেঁলাঁম রে!"

"ঘুসি মেরেছে?" আমি একই সাথে অবাক আর ভয় পেয়ে বললাম, "কে ঘুসি মেরেছে?"

"এঁকটা মেঁয়ে।"

"একটা মেয়ে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "মেয়ে ভিতরে কী করছে?"

জয়ন্ত নাক চেপে রেখে বলল, "আঁমি কেঁমন কঁরে বঁলব। বেঁধে রেঁখেছে।"

"বেঁধে রেখেছে!" এবারে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বেঁধে রাখা অবস্থায় যেই মেয়ে ঘুসি মেরে জয়ন্তের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে তার থেকে একটু সাবধান

ভালো। আমি এবার সাবধানে উঁকি দিলাম, সাবধান ছিলাম বলে মেয়েটা ঠিকভাবে আমাকে ঘুসি মারতে পারল না। দুই হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা তাই ঠিকভাবে ঘুসি মারা খুব সহজ নয়।

আমি একটু অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মেয়েটাও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটার বয়স আমাদের সমান কিংবা একটু কম হবে। স্কুলের পোশাক পরা, মাথার চুল এলোমেলো—কপালে মুখে একটা কাটা দাগ—ভয়ানক কোনো ধস্তাধস্তি করে মেয়েটাকে ধরতে হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?"

মেয়েটা আমার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কে?"

আমি বললাম, "আমার নাম ইবু। কিন্তু আমার নাম বললে তো তুমি চিনবে না। তুমি এখানে কেন? কী হয়েছে?"

"আমাকে কিডন্যাপ করে এনেছে। বদমাইশের বাচ্চাগুলো।"

আমি চমকে উঠলাম, "সর্বনাশ!" বাইরে তাকিয়ে অন্যদের বললাম, "এই মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে এনেছে।"

কাজল চোখ বড় বড় করে বলল, "কিডন্যাপ? আবার কিডন্যাপ?"

"হ্যাঁ।"

"মনে আছে তো আগেরবার কিডন্যাপ নিয়ে কী ঝামেলা হল?"

"ধুর গাধা—" আমি কাজলকে ধমক দিয়ে বললাম, "এটা সেরকম না। সত্যি সত্যি কিডন্যাপ।"

মেয়েটা বলল, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা বন্ধ করে আমাকে খুলে দেবে?"

আমি বললাম, "দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি।" জয়ন্ত তার নাক চেপে বসে রইল, কাসেম আর তারেক নৌকায় উঠে এল। কাসেম চাকুটা বের করে মেয়েটার দড়ির বাঁধন কেটে দেয়। মেয়েটা তার আঙুলগুলো কয়েকবার খুলে আর বন্ধ করে তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "থ্যাংক ইউ।"

তারেক বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।"

আমি বললাম, "আমাদের তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। বদি আর কুদ্দুস আসলে বিপদ হবে।"

মেয়েটা বলল, "বদমাইশের বাচ্চা!"

আমি ধরে নিলাম গালিগুলো বদি আর কুদ্দুসের উদ্দেশে, আমাদের উদ্দেশে না। মেয়েটা নৌকা থেকে বের হয়ে আমাদের সবার দিকে তাকাল, তারপর একটু অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কারা? তোমাদের এই অবস্থা কেন?"

"কী অবস্থা?

"নোংরা ময়লা—শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। দেখে মনে হয় জীবনে গোসল কর নাই।"

"তার কারণ হচ্ছে আমরা আসলে নোংরা, ময়লা, আর তাই আমাদের শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। এবং আসলেই আমরা অনেক দিন গোসল করি নাই।"

"কেন?"

"সেইটা অনেক লম্বা স্টোরি।" আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, "তার থেকে বেশি ইম্পরট্যান্ট তোমার স্টোরি। তোমাকে কেন কিডন্যাপ করেছে?"

মেয়েটা উত্তর দেবার আগেই কাসেম নৌকার ভেতর থেকে বলল, "পেয়েছি!"

কাসেমের গলার স্বরে আনন্দ রাগ এসব থাকে না—কিন্তু এই প্রথমবার মনে হল তার গলার স্বরে এক ধরনের আনন্দ।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কী পেয়েছিস?"

"পানি আর খাবার।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। দাঁড়া আমি নিয়ে আসি।"

কাসেম একটা মাটির কলসি নিয়ে আসে, সেটা পানি দিয়ে ভরা। টলটলে খাবার পানি, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। কাসেম খুঁজে একটা গ্লাস বের করে আনা পর্যন্ত আমাদের তর সইল না। আমরা সরাসরি কলসি থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে খেতে থাকি।

মেয়েটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পর বলল, "তোমরা পানি খেতে পাও না?"

আমি বললাম, "নাহ! অল্প একটু পানি আর জুস। তাই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খাচ্ছি।"

"কেন?"

"সেটা অনেক লম্বা স্টোরি।"

কাসেম ততক্ষণে নৌকার ভেতর থেকে এক কাঁদি কলা নিয়ে এসেছে—চোখের পলকে আমরা সেই কলাগুলো খেয়ে ফেললাম। মেয়েটাকে একটা সেধেছিলাম সে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কলা খাই না।" খানিকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা ছাড়া তোমাদের যা খিদে—আমি খেলেও তোমাদের দিয়ে দিতাম।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ। আমরা গত চব্বিশ ঘণ্টা কিছু খাই নাই।"

নৌকার ভেতরে খুঁজে খুঁজে কাসেম আরো খাবার বের করে আনে—খিদের প্রথম ধাক্কাটা একটু শান্ত হয়েছে বলে আমরা জংলির মতো খাওয়া বন্ধ করে সেগুলো ব্যাকপেকের মাঝে ভরে নিই। পানির খালি বোতলে পানি ভরে নেওয়া হল—এখন মোটামুটি আগামী দুই দিন চালিয়ে দেওয়া যাবে।

বদি আর কুদ্দুস যদি ফিরে আসে সেজন্যে আমরা তাড়াহুড়ো করছিলাম—আমি অবিশ্যি গুলির শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছি, হরিণ শিকার করতে গেছে কাজেই তারা ফিরে আসার আগে নিশ্চয়ই কয়েকটা গুলির শব্দ শুনব। কিন্তু সাধারণত আমাদের কপাল খুব খারাপ—মানুষ দুজন হঠাৎ করে চলে এলে আমি খুব বেশি অবাক হব না। জয়ন্ত তার নাকে হাত বুলাতে বুলাতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, তুমি কথা নাই বার্তা নাই আমার নাকে ঘুসি মারলে কেন?"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি বদমাইশগুলোর একজন।"

"আমাকে দেখে তাই মনে হয়?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। তোমাদের সবাইকে দেখে তাই মনে হয়।"

কাজল বলল, "অনেক দিন গোসল করি নাই তো।"

"সেই জন্যে না। তোমাদের চেহারার মাঝেই কিছু গোলমাল আছে। দেখলেই মনে হয় তোমাদের মাথায় কোনো একটা বদ মতলব—"

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। আমাদের সম্পর্কে এর আগেও অনেকে এরকম কথাবার্তা বলেছে কিন্তু এরকম খোলামেলাভাবে কেউ বলে নি। আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী?"

"আনিকা।"

"কোন ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস সেভেনে।"

আমি সবাইকে দেখিয়ে বললাম, "আমরা সবাই ক্লাস এইটে পড়ি। আমরা তোমার থেকে বড়।"

মেয়েটা ঠোঁট ওল্টাল, বলল, "কী আমার বড়! ক্লাস সেভেন আর ক্লাস এইট একই ব্যাপার। ফুটবল খেলায় ক্লাস এইটকে আমরা চার গোলে হারিয়ে দিয়েছিলাম।"

আমরা আবার একটু চমকে উঠলাম, এই মেয়ে আবার ফুটবল খেলে নাকি? মেয়েটা বলল, "তোমরা এইখানে কী করছ?"

আমি বললাম, "সেইটা অনেক লম্বা স্টোরি।"

আনিকা নামের মেয়েটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "যতবার জিজ্ঞেস করি ততবার বল লম্বা স্টোরি। শুরু করলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত।"

"হ্যাঁ শুরু করব। কিন্তু আগে আমাদের এখান থেকে পালানো দরকার। বদি আর কুদ্দুস যদি চলে আসে—"

আনিকা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "বদমাইশের বাচ্চাগুলো—"

জয়ন্ত বলল, "যখন এসে দেখবে আনিকা নেই তখন আমাদের খুঁজতে বের হবে না?"

কাজল মাথা নাড়ল, বলল, "বের হবে।"

যদি পেয়ে যায়? তাদের হাতে বন্দুকও আছে!"

আনিকা বলল, "বদমাইশের বাচ্চাগুলো!"

আমি বললাম, "একটা কাজ করলে কি হয়?"

"কী কাজ?"

"এমনভাবে নৌকাটা রেখে যাই যেন লোকগুলো এসে মনে করে আনিকাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে।"

"বাঘে ধরে?"

'হ্যাঁ।"

"কেমন করে সেটা করবি?"

"কেন—নৌকার ভেতরে বাঘের খামচাখামচি করে রাখব। যে দড়িটা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল সেটা ছিঁড়ে রাখব—পুরো নৌকাটা ওলটপালট করে রাখব। তারপর তারপর—" আমি আনিকার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আনিকাকে আমাদের একটা শার্ট পরিয়ে তার শার্টটা রক্ত মাখিয়ে দিয়ে এখানে-সেখানে রেখে দেব।"

"রক্ত মাখিয়ে?" জয়ন্ত বলল, "রক্ত পাবি কোথায়?"

আমি মাথা চুলকালাম, "সেইটাই সমস্যা।" কাসেমের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কাসেম, তোর তো অনেক রক্ত—তুই দিবি হাফ কেজি—"

কাসেম বলল, "দিব।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ঠাট্টা করছিলাম, তোকে সত্যি সত্যি দিতে হবে না।"

কাসেম বলল, "আমি সত্যি সত্যি দেব!"

তারপর এক লাফে নৌকার ভিতরে ঢুকে গেল। আমি ভয় পেয়ে বললাম, "কাসেম, কাসেম আমি ঠাট্টা করছিলাম!"

কাসেম এক মুহূর্ত পরে নৌকা থেকে আবার বের হয়ে এল, তার এক হাতে চাকু অন্য হাতে দুটো মুরগি! কাসেম দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোকে রক্ত দেব— কিন্তু সেটা হবে মুরগির রক্ত!"

আমরা অবাক হয়ে কাসেমের দিকে তাকিয়ে রইলাম—তাকে আমরা একেবারে ভোঁতা টাইপের মানুষ বলে জানতাম—কিন্তু আসলে দেখি তার ভেতরেও রস আছে! কে জানে আনিকার মতো তেজী টাইপের একটা মেয়ে দেখে মনে হয় তার রস বের হতে শুরু করেছে।

আনিকার শার্টটা বদলানো নিয়ে একটা সমস্যা হল—প্রথমে আমাদের কারো শার্ট সে পরতে চায় না—সবগুলোতে নাকি দুর্গন্ধ। অনেক কষ্ট করে তারেকের একটা পরিষ্কার শার্ট পরাতে রাজি করালাম। শার্টটা কোথায় বদলাবে সেটা নিয়ে আরেকটা সমস্যা হল—শেষে নৌকার ভেতরে ঢুকে সে শার্ট বদলে এল। আমরা নৌকার ভেতরের দড়িটাকে চাকু দিয়ে এবড়োখেবড়ো করে কাটলাম যেন দেখে মনে হয় সেটা টেনে ছেঁড়া হয়েছে। ঘাট থেকে কাদা তুলে নৌকার মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলাম। চাকু দিয়ে নৌকার পাটাতনে আঁচড়ের দাগ তৈরি করলাম। আনিকার শার্টটাতে কাজলকে বসিয়ে কাসেম সেটাকে টেনে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গেল—দেখে মনে হয় একজনকে টেনে নেওয়া হয়েছে। মুরগি দুটোকে জবাই করে তার রক্ত নৌকার ভেতরে, বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলাম। আনিকার শার্টটাতে কাদামাটি লেগে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সেটাতে কিছু রক্ত মাখিয়ে গাছের গুঁড়িতে ফেলে রাখলাম। কাসেম নৌকার ভেতরে লাথি মেরে যা কিছু আছে ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে দিল—তারপর গাছের ডাল ভেঙে খুব সাবধানে মাটিতে যেখানে আমাদের পায়ের ছাপ আছে সেগুলো মুছে দিলাম।

এরকম সময় আমরা দূরে পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, "ঐ যে! হরিণ মারছে।"

আনিকা বলল, "বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ!"

আমরা বললাম, "চল এখন পালাই।"

কাজেই আমরা তখন সরে পড়লাম।

আমাদের অবস্থাটা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হয় আগের থেকে ভালো, কারণ আমাদের এখন পানির অভাব নেই খাবারেরও অভাব নেই। এই প্রথমবার একেবারে তৃপ্তি করে পানি খেয়েছি, খাবার খেয়েছি। আমাদের সাথে নূতন আরেকজন এসেছে, সেটা আরেকটা ভালো ব্যাপার। একসাথে যত

মানুষ থাকে তত সুবিধে—তা ছাড়া আনিকা শক্ত-সমর্থ মেয়ে, বুকের ভেতর একেবারে ভয়ডর নেই।

আবার মনে হচ্ছে অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। কারণ আগে আমরা শুধু জঙ্গলে সময় কাটাচ্ছিলাম, এখন লুকিয়ে সময় কাটাতে হবে। বদি আর কুদ্দুস যদি আমাদের দেখে ফেলে সেটা বিশাল একটা সমস্যা হয়ে যাবে। এই জঙ্গলে যে একটা আস্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটাও আমরা জানতাম না, এখন জেনেছি, জেনে ভয়ে পেটের ভাত চাউল হয়ে যাচ্ছে।

বদি আর কুদ্দুস যখন তাদের হরিণ নিয়ে ফিরে এসেছে তখন অনেক দূর থেকে আমরা তাদের লক্ষ করছি। ঘাড়ে করে একটা আস্ত হরিণ এনে ধপাস করে নিচে ফেলে নৌকার ভেতরে ঢুকেই একটা চিৎকার দিল! এদিক-সেদিক তাকাল, তারপর তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে রইল, ভয়ে তাদের দুজনের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে আছে।

আমাদের কাছে জয়ন্তের বাইনোকুলার, সেটা দিয়ে একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়, কথা ভালো শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু তারপরেও কী বলছে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। বদি আর কুদ্দুস যে খুব ভয় পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দোয়া-কালাম পড়ে একটু পরে পরে বুকে ফুঁ দিচ্ছে। বাইনোকুলারে দেখে একটু পরে পরে আনিকা দাঁতে দাঁত ঘষে বলছে, "বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ!"

আমরা অনেক দূরে—আমাদের কথা বদি আর কুদ্দুস শুনতে পারবে না, তার পরেও আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। কাজল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এই যে পাজি লোকগুলো দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিচ্ছে, তাতে কী কাজে দিবে?"

কাসেম মাথা নাড়ল, বলল, "কাজে দিবে না।"

কাজল বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

কাসেম বলল, "জানি। সেভেন্টি ওয়ানে রাজাকারগুলো কি এই লম্বা দাড়ি রেখে মাথায় টুপি পরে আল্লাহরে ডেকে পাকিস্তানের কথা বলে নাই? বলেছে। আল্লাহ তাদের কথা শুনে নাই। আল্লাহ মুক্তিবাহিনীর কথা শুনেছে! আল্লাহ খুব ভালো করে জানে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক!"

একেবারে অকাট্য যুক্তি। কাসেম কথা কম বলে কিন্তু যখন বলে তখন যুক্তিতে কোনো ভুল থাকে না।

আমরা যখন নিচু গলায় কথা বলছি তখন আনিকা বাইনোকুলার দিয়ে বদি আর কুদ্দুসকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে আর একটু পরপর নিচুগলায় গালি দিচ্ছে। আমরা যেরকম অনেক ধরনের গালি জানি আনিকা অবশ্য সেরকম না, সে শুধু একটাই গালি জানে সেটা হচ্ছে "বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ!" সেটাই সে নানাভাবে দিয়ে যাচ্ছে। একবার জোরে, একবার আস্তে, একবার তাড়াতাড়ি, একবার ধীরে ধীরে, একবার চাপা স্বরে, একবারে দাঁতে দাঁতে ঘষে। একটা কথা যে এত ভাবে বলা যায় আনিকাকে না দেখলে আমরা সেটা বিশ্বাস করতাম না। বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে বাইনোকুলারটা নামিয়ে বলল, "একটা কাজ করলে কী হয়?"

"কী কাজ?"

"ঐ বদি আর কুদ্দুসকে ধরে ফেললে কেমন হয়?"

"ধরে ফেললে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "ধরে ফেললে মানে?"

"ধরে ফেললে মানে ধরে ফেললে।" আনিকা মুখ শক্ত করে বলল, "আমরা ছয় জন মানুষ। ওরা মাত্র দুই জন। আমরা তিন জন মিলে এক জনকে ধরব। দুইটাই আসলে ভীতুর ডিম। হঠাৎ করে লাফিয়ে পড়লে এমনিতেই হার্টফেল করে ফেলবে।"

আমরা একটু অবাক হয়ে এই খ্যাপা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকি। এর মাঝে আসলেই কোনো ভয়ডর নেই। কাজল আমতা-আমতা করে বলল, "এই মানুষগুলোর কাছে বন্দুক আছে।"

"বন্দুক থাকলে কী হবে? আমরা কি বন্দুককে ভয় পাই নাকি?"

আমরা মুখ হাঁ করে আনিকার দিকে তাকালাম। বন্দুককে ভয় পায় না এটা কী রকম মেয়েরে বাবা?

আনিকা বলল, "আমি জয়ন্ত আর কাজল ধরব বদিকে—"

জয়ন্ত বলল, "জয়ন্ত না বল জয়ন্তদা। আমি তোমার বড়।"

"ইস্!" আনিকা ঠোঁট উল্টে বলল, "এক বছরের বড় আবার বড় নাকি!"

এই খ্যাপা টাইপের মেয়েটা এবারে হঠাৎ রওনা দিয়ে দেয়। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "দাঁড়াও। দাঁড়াও—তুমি একা কোথায় যাচ্ছ?"

"তোমরা যেরকম ভীতুর ডিম—আমার একাই যেতে হবে।"

"আমরা মোটেই ভীতুর ডিম না। আমরা খালি হাতে কোমাডো ড্রাগনের সাথে ফাইট করেছি। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছয় ইঞ্চি দূর থেকে দেখেছি।"

আনিকা বলল, "গুলপট্টি। সাহস থাকলে আমার সাথে আস।"

কাসেম বলল, "আইডিয়াটা কিন্তু খারাপ না। আমি একলাই দুইটার লাশ ফেলে দিতে পারব।"

আমি বললাম, "লাশ ফেলতে হবে না। কাবু করলেই হবে।"

কাসেম বলল, "কোনো ব্যাপার না।"

"তা হলে চল।"

তারেক বলল, "নৌকাটা ডখল করলে রাটরে আমাডের গাছে ঘুমাটে হবে না। আমরা নৌকায় ঘুমাটে পারব।"

এটা সত্যি কথা। নৌকায় আরাম করে ঘুমাতে পারব চিন্তা করেই হঠাৎ করে আমরা অন্য এক ধরনের উৎসাহ পেয়ে গেলাম। আমরা বসে একটু পরিকল্পনা করে নেই। আনিকা, জয়ন্ত আর কাজল ধরবে বদিকে। আমি কাসেম আর তারেক ধরব কুদ্দুসকে। আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাব, এক ভাগ যাবে বাম দিক দিয়ে অন্য ভাগ যাবে ডান দিয়ে—পুরো ব্যাপারটা হবে একেবারে সাঁড়াশি আক্রমণ।

আমরা তখন রওনা দিয়ে দিলাম। পুরো এলাকাটা গাছগাছালি দিয়ে ভরা— একেবারে খালের কাছে এসে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গা পৌঁছানোর আগে আমাদের ওরা দেখতেই পারবে না। হঠাৎ করে বন্দুক দিয়ে গুলি করে না ফেললে পুরো ব্যাপারটা আসলেই একেবারে পানির মতো সহজ হবার কথা।

আমরা যখন ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুড়ি মেরে অগ্রসর হয়ে খালের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি ঠিক তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ করে একটা ট্রলারের শব্দ শুনতে পেলাম—ট্রলারে করে কেউ আসছে। কারা আসছে দেখার জন্যে আমরা থেমে গেলাম। বেশ খানিকটা দূরে আনিকা, জয়ন্ত আর কাজল, তাদেরকেও হাত দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বললাম। কারা আসছে, কেন আসছে ব্যাপারটা বোঝা দরকার।

যখন আমরা বুঝতে পারলাম কল্পনার অ্যাডভেঞ্চার আর বাস্তবের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য।

ট্রলারটা নদী ধরে এসে খালের ভেতরে ঢুকে গেল, শুধু যে ঢুকে গেল তাই না, সোজা নৌকাটার কাছে যেতে লাগল দেখে মনে হতে থাকে যেন ট্রলারের মানুষগুলো জানে কোথায় যেতে হবে। নৌকার খুব কাছাকাছি এসে ট্রলারটা থেমে যায়। ট্রলারের ঠিক সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার বয়স খুব বেশি না, কালো প্যান্ট আর চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে, চোখে কালো সানগ্লাস। চেহারাটা বেশ ভালোই, দেখে মনে হয় টেলিভিশনে অভিনয় করে। একজন মাঝি ট্রলারটা চালিয়ে এনেছে, সে ছাড়াও আরো একজন মানুষ আছে ট্রলারে। জিনসের প্যান্ট আর উলের সোয়েটার পরে আছে, মাথায় লাল একটা টুপি।

ট্রলারটা থামতেই সানগ্লাস পরা মানুষটা লাফ দিয়ে নিচে নেমে চিৎকার করে ডাকল, "বদি—কুদ্দুস—"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, তার মানে এরা আসলে একই দলের মানুষ। ঝামেলা মনে হয় এখন বেড়েই যাবে। সানগ্লাস পরা মানুষটার ধৈর্য মনে হয় কম, এবারে চিৎকার করে বলল, "কোথায় গেলি বইদ্যা আর কুদ্দুইস্যা—"

এবারে বদি আর কুদ্দুস তাদের নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে আসে। সানগ্লাস পরা মানুষটা হুকুম দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, "মাইয়াটারে নিয়া আয়। কুইক।"

কুদ্দুস এবার মুখ কাচুমাচু করে বলল, "সর্বনাশ হইছে সুলতান ভাই।"

সুলতান নামের মানুষটার মুখটা কালো হয়ে যায় সাথে সাথে। হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললি? কী বললি হারামজাদা?"

কুদ্দুস শুকনো গলায় বলল, "মাইয়াটারে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে।"

সুলতান কিছুক্ষণ কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর চিৎকার করে বলে, "বাঘে ধরে নিয়ে গেছে? আমার সাথে মস্করা?"

তারপর হঠাৎ সে কোমর থেকে একটা রিভলবার বের করে কুদ্দুসের মাথার মাঝে ধরে চিৎকার করে বলল, "সত্যি করে বল হারামজাদা, কী হইছে।"

কুদ্দুস নামের মানুষটা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আল্লাহর কসম লাগে সুলতান ভাই—"

সুলতান বাম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কুদ্দুসের মুখে একটা চড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আল্লাহর নাম মুখে নিস না তুই, শুয়োরের বাচ্চা। সত্যি করে বল আমার সাথে গাদ্দারি করে তুই কোন পার্টির সাথে লাইন করছস?"

"কোনো পার্টির সাথে লাইন করি নাই।" কুদ্দুস ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আপনার জন্যে একটা হরিণ শিকার করতে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকেছিলাম—এসে দেখি—"

"কী দেখেছিস?"

"মেয়েটা নাই। রক্ত পড়ে আছে। নৌকা ভেঙেচুরে শেষ।"

বদি এতক্ষণ চুপ করেছিল, এইবার ভয়ে ভয়ে বলল, "মেয়েটার জামাটাও পাওয়া গেছে—রক্ত মাখানো— ছেঁড়া।"

সুলতান পা দিয়ে মাটিতে লাথি দিয়ে খুব খারাপ একটা গালি দিয়ে কুদ্দুসকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দিয়ে বলল, "শুয়োরের বাচ্চারা, তোরা একটা কাজ ঠিক করে করতে পারস না? মেয়ের বাপ-মা এক কথাতে দশ লাখ টাকা দিতে রাজি শুধু পুলিশ নিয়ে ঝামেলা—মেয়েটার একটা ভিডিও দেখতে চায়—এখন এই ভিডিও আমি কোথায় পাই?"

কুদ্দুস মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় হাত জোড় করে বলল, "আমার কোনো দোষ নাই সুলতান ভাই। আপনি আসবেন সেই জন্যে একটা হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলাম।"

বদি আবার ভয়ে ভয়ে বলল, "সত্য কথা সুলতান ভাই। হরিণের মাংস আপনার ফেবারিট সেই জন্যে একটা কচি হরিণ—"

"চোপ থাক শুয়োরের বাচ্চা—" বলে সুলতান হাত ঘুরিয়ে এত জোরে বদির মুখে মেরে বসল যে বদি মুখে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

সুলতানের ভয়ঙ্কর মুখটা রাগে থমথম করতে থাকে। বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নৌকা কই?"

বদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই ঝোপের নিচে।"

সুলতান নৌকার দিকে হাঁটতে থাকে, বদি আর কুদ্দুস তার পিছু পিছু যায়। বদি নৌকার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, "এই দেখেন সুলতান ভাই, রক্ত। এই দেখেন বাঘের আঁচড়—নৌকার ভিতরের অবস্থাটা একবার দেখেন।"

সুলতান কিছুক্ষণ দেখে বলল, "মেয়ের জামাটা কই?"

বদি তাড়াতাড়ি আনিকার রক্ত মাখা শার্টটা দিল। আমাদের হাতের কাজ অপূর্ব—সত্যিকারের বাঘও এর থেকে ভালো কাজ করতে পারবে না।

সুলতান দুই হাতে আনিকার শার্টটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বলল, "কুদ্দুস।"

"জি সুলতান ভাই।"

"আমার কাছে আয়।"

কুদ্দুস ভয়ে ভয়ে সুলতানের কাছে এল। সুলতান বলল, "সোয়েটার খোল।"

কুদ্দুস ভয়ে ভয়ে বলল, "সোয়েটার খুলব?"

"হ্যাঁ।"

কুদ্দুস অবাক হয়ে সুলতানের দিকে তাকাল কিন্তু কোনো কথা না বলে সোয়েটার খুলল। ভেতরে সবুজ রঙের একটা চেক শার্ট।

সুলতান কুদ্দুসের কাছে গিয়ে বলল, "মনে কর আমি বাঘ, তোরে খাবার জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তখন একটা গাছের ডালে তোর শার্টটা লেগে এইভাবে ছিঁড়ে গেল—" বলেই সে কুদ্দুসের শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়— তারপর টেনে কুদ্দুসের শরীর থেকে শার্টটা খুলে ফেলে।

কুদ্দুস তখনো অবাক হয়ে সুলতানের দিকে তাকিয়ে আছে। সুলতান শার্টটা কুদ্দুসের হাতে দিয়ে বলল, "নে, দেখ।"

কুদ্দুস অবাক হয়ে একবার সুলতানের দিকে তাকাল আরেকবার তার শার্টের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "কী দেখব সুলতান ভাই?"

"বোতামগুলি দেখ। বোতাম আছে?"

কুদ্দুস মাথা নাড়ল, "না, নাই। ছিঁড়ে গেছে।"

সুলতান এবারে আনিকার শার্টটা কুদ্দুসের হাতে দিয়ে বলল, "আর এই মেয়ের শার্টে বোতামের কী অবস্থা?"

কুদ্দুস শার্টটা দেখে বলল, "সবগুলো বোতাম আছে!"

"তার মানে কী কুদ্দুস শুয়োরের বাচ্চা?"

কুদ্দুস আমতা-আমতা করে বলল, "তার মানে তার মানে—"

সুলতান কুদ্দুসের চুলের ঝুঁটি ধরে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "তার মানে তোর বাঘ তার থাবা দিয়ে খুব সুন্দর করে এই মেয়ের শার্টের বোতাম খুলেছে! সেই জন্যে কোনো বোতাম ছিঁড়ে নাই—"

আমি কাসেম আর তারেক একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। সর্বনাশ হয়েছে! সুলতান নামের এই ভয়ঙ্কর মানুষটা আমাদের এত সুন্দর পরিকল্পনাটা ধরে ফেলেছে। এখন কী হবে? আমরা ঝোপের ভিতর থেকে নিঃশব্দে আমাদের সামনে এই ভয়ঙ্কর নাটকটা দেখতে থাকি।

সুলতান কুদ্দুসের চুলের ঝুঁটি ধরে কাছে এনে আবার ঠেলে দিয়ে রিভলবারটা তার মাথার দিকে লক্ষ করে বলল, "এবারে বল হারামজাদা কার কাছ থেকে কত টাকা খেয়েছিস।"

কুদ্দুস দুই হাত জোড় করে বলল, "খোদার কসম লাগে সুলতান ভাই। বিশ্বাস করেন আপনি—আল্লাহর নামে কিরা কাটি আমি কিছু জানি না—"

"তুই কিছু জানিস না?"

"না সুলতান ভাই—"

বদি একটু এগিয়ে এসে বলল, "সত্যি কথা সুলতান ভাই। আমি আর কুদ্দুস একসাথে ছিলাম। আপনার জন্যে একটা হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলাম—"

"তা হলে তোরা বেইমানি করস নাই?"

"এটা আপনি কী বলেন সুলতান ভাই? আপনার সাথে আমরা বেইমানি করব? তা হলে দোজখেও আমাদের জায়গা হবে না—"

সুলতান হঠাৎ থমথমে মুখে জঙ্গলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল আর সাথে সাথে ভয়ে আমাদের পেটের ভিতর পাক দিয়ে ওঠে। সর্বনাশ! এখন কী হবে?

সুলতান আবার কুদ্দুস আর বদির দিকে তাকাল—তারপর কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল, "এইখানে কোনো ট্রলার না হলে নৌকা আসতে শুনেছিস?"

দুইজনেই জোরে জোরে মাথা নাড়ল। কুদ্দুস বলল, "জে না সুলতান ভাই শুনি নাই।"

"তা হলে এই মেয়ে এইখানেই আছে।" সুলতান সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "খোঁজ। খুঁজে বের কর।"

আমরা কী করব বুঝতে পারলাম না, ভয়ে-আতঙ্কে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল, মানুষগুলোকে তো বেশিক্ষণ খুঁজতেও হবে না—আমরা তো একেবারেই তাদের কাছে, একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবে। সুলতান নিজে তার ট্রলারের মাঝি, লাল টুপি পরা মানুষটি এবং বদি আর কুদ্দুস খুঁজতে বের হল। কুদ্দুসের হাতে বন্দুক, সুলতানের হাতে একটা রিভলবার, লাল টুপি পরা মানুষটার হাতে একটা ছোট বন্দুক—মনে হয় এইটাকে কাটা রাইফেল বলে। মাঝি হাতে নিল একটা বড় লাঠি, বদি নিল একটা বড় দা—কে জানে এইগুলোকে মনে হয় কিরিচি বলে। তারপর এই ভয়ঙ্কর ঝোপঝাড়ে পা দিয়ে লাথি মেরে, গাছের ওপরে তাকিয়ে দলটা এগিয়ে আসতে শুরু করল। সুলতান আর বদি আসছে সোজাসুজি আমাদের দিকে, কুদ্দুস আর লাল টুপি পরা মানুষটা যাচ্ছে আনিকাদের দিকে, মাঝিটা যাচ্ছে এই দুই দলের মাঝ দিয়ে। আর একমুহূর্ত, তারপর আমরা ধরা পড়ে যাব, গভীর হতাশা আর আতঙ্কে আমার বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। এখন কী হবে?

ঠিক তখন আমরা হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেলাম। মাথা তুলে দেখতে পারছি না ঠিক কী হচ্ছে। সাথে সাথে কুদ্দুসের চিৎকার শুনতে পেলাম, "ঐ যে—ঐ যে—ঐ যে—যায়—"

আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছিল সুলতান আর বদি—এইবারে হইচই চিৎকার শুনে আনিকাদের দিকে ছুটে গেল—আমি একটা গুলির শব্দও শুনতে পেলাম। সর্বনাশ! কে কাকে গুলি করেছে?

আমি কুদ্দুসের একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম, তারপর আনিকার গলার আওয়াজ, "খবরদার আমার গায়ে হাত দিবি না বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ।"

সুলতান বলল, "এই মেয়ের তেজ দেখি খুব বেশি।"

কুদ্দুস ককাতে ককাতে বলল, "কামড় দিয়ে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে।"

আনিকা বলল, "তোমার দুই চোখ আমি সকেট থেকে তুলে নেব। বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ।"

বদি বলল, "এই মেয়ে খুব ডেঞ্জারাস। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি তারপরেও বেকায়দা জায়গায় যা একটা লাথি মেরেছে—"

সুলতান বলল, "সবগুলোকে ধরে নিয়ে আয়।"

একটু পরে আমি দেখতে পেলাম ছোট দলটা কাজল, জয়ন্ত আর আনিকাকে ধরে আনছে। কাজলের মুখ ফ্যাকাসে আর রক্তহীন, জয়ন্তকে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আনিকার মুখে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব।

ট্রলারের কাছাকাছি এসে সুলতান সেটার গলুইয়ে পা ভাঁজ করে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, "তা হলে আমার সোনার চানেরা ঘটনাটি কী আমাকে বল।"

জয়ন্ত, কাজল কিংবা আনিকা কেউ কোনো কথা বলল না। সুলতান সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে বলল, "তোমরা কারা? এইখানে কী করতে এসেছ?"

জয়ন্ত এইবারে কথা বলল, "আমরা সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলাম বাংলাদেশ অভিযাত্রী সমিতির সাথে—"

"ঐ যে বড় সাদা জাহাজ? দুনিয়ার আণ্ডা-বাচ্চা-কবি-সাহিত্যিক?"

"হ্যাঁ।"

"ঐটা তো কাল চলে গেছে!"

"হ্যাঁ। ভুল করে আমাদের ফেলে গেছে।"

"ভুল করে ফেলে গেছে?" সুলতান অবাক হয়ে বলল, "ভুল করে তোমাদের মতো বাচ্চা ছেলেদের কেউ ফেলে যায়?"

জয়ন্ত বলল, "তারা মনে করেছে আমরা সাংবাদিকদের সাথে মংলা হয়ে ঢাকা চলে গেছি। আসলে যাই নাই। আমি আর কাজল পাখি এক্সপার্টদের সাথে এইখানে এসেছি।"

"কী এক্সপার্ট?"

"পাখি এক্সপার্ট।"

সুলতান তার দলের লোকদের দিকে তাকাল—তারপর হো হো করে হেসে উঠল, আনিকাকে আবার ধরে ফেলতে পেরে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। হাসতে হাসতে বলল, "পাখি এক্সপার্টরা কী করে?"

"পাখি নিয়ে গবেষণা করে। পাখি দেখে। পাখির ছবি তোলে। পাখির ডাক রেকর্ড করে।"

জয়ন্ত যেন খুব একটা রসিকতা করেছে সেরকম ভাব করে সুলতান হা হা করে হাসতে থাকে, অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, "তারপর?"

জয়ন্ত আবার শুরু করে—কবি মানুষ হলে কী হবে সে খুব গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। মিথ্যা বলতে হয় সত্যির খুব কাছাকাছি যেন কেউ সন্দেহ না করে। জয়ন্ত তাই করছে। সে যা বলছে সব সত্যি কথা শুধু একটা ছোট মিথ্যা ঢুকিয়ে দিয়েছে, বারবার বলছে সে আর কাজল এই দুজন আটকা পড়েছে। আমাদের তিন জনের কথা ভুলেও মুখে আনছে না। আমরা শুনলাম কাজল বলছে, "পাখি এক্সপার্টরা খেয়াল করে নাই, তারা পাখি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে, মানুষের খেয়াল করে না, তাই আমাদের দুইজনকে রেখে ভুল করে চলে গেছে!"

"এখন?"

"এখন আমরা এখানে আটকা পড়ে গেছি। তাই—"

"তাই—"

"তাই যখন এই নৌকাটা দেখলাম তখন ভাবলাম আমরা বেঁচে যাব। কিন্তু নৌকায় গিয়ে দেখি আনিকাকে বেঁধে রেখেছে।"

আনিকা তখন বলল, "বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ—"

সুলতান মুখটা হাসি হাসি করে আনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমার সাথে কথা বলছি না মেয়ে। তুমি কেন কথা বলছ?"

তারপর আবার জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপরে কী হল?"

"যখন দেখলাম আনিকাকে বেঁধে রেখেছে তখন তাড়াতাড়ি খুলে দিলাম। তখন মনে হল আমাদের যদি খুঁজে বের করে ফেলে? তাই ভাব দেখালাম যেন বাঘে ধরে নিয়ে গেছে।"

"বুদ্ধিটা কার মাথা থেকে বের হয়েছে?"

জয়ন্ত কাজলকে দেখিয়ে বলল, "এই যে এর মাথা থেকে। এর মাথায় খুব বুদ্ধি। এই জন্যে বেশি কথা বলে না।"

কাজল মুখ খুললে যদি ভুল করে অন্য কিছু বলে দেয় এই জন্যে জয়ন্ত আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে সে বেশি কথা বলে না। জয়ন্তের পেটে পেটে ফিচলে বুদ্ধি।

সুলতান এইবার কাজলের দিকে তাকাল, "তুমি বেশি কথা বল না?"

কাজল না-সূচক ভাবে মাথা নাড়ল।

"বাঘে ধরার বুদ্ধিটা ভালোই বের করেছ, তবে একটা ভুল করে ফেলেছ! বুঝেছ?"

কাজল মাথা নাড়ল। বলল, "পরেরবার ভুল হবে না। বোতামগুলো ছিঁড়ে রাখব।"

সুলতানের মনটা এখন খুব ভালো, কাজলের কথা শুনে আবার সে হা হা করে হেসে বলল, "তোমার কী মনে হয়? তোমাদের কি পরেরবার আরেকটা সুযোগ আসতে পারে?"

কাজল হ্যাঁ-সূচক ভাবে মাথা নাড়ল। তখন সুলতানের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সে মাথা নেড়ে বলল, "না। তোমরা আর সুযোগ পাবে না। একবার পেয়েছ, সেইটাই অনেক বেশি। বদি আর কুদ্দুস হচ্ছে বেকুবের বেকুব সেইজন্যে পেরেছ। আর পারবে না। বুঝেছ?"

কাজল, জয়ন্ত বা আনিকা কোনো কথা বলল না। সুলতান তখন লাল টুপি পরা মানুষটাকে উদ্দেশ করে বলল, "এই চান্দু। ভিডিও ক্যামেরাটা আন।"

একজন মানুষের নাম চান্দু হয় কেমন করে কে জানে! বাবা-মা কি কখনো নিজের ছেলের নাম চান্দু রাখতে পারে? কে জানে হয়তো নামটা ছিল চাঁদ মিয়া সেখান থেকে চান্দু হয়ে গেছে। আমরা দেখলাম চান্দু ট্রলারের ভিতর থেকে একটা ব্যাগ বের করে আনে, সেটা খুলে একটা ভিডিও ক্যামেরা বের করে সুলতানের হাতে দেয়। সুলতান সেটা হাতে নিয়ে আনিকাকে বলল, "এখন তোমার বাবা-মায়ের কাছে পাঠানোর জন্যে একটা ভিডিও করতে হবে। তুমি তোমার চুলটুল একটু ঠিক করে নাও।"

আনিকা কোনো কথা না বলে চোখ দিয়ে আগুন বের করে সুলতানের দিকে তাকিয়ে রইল। সুলতান তার ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বের করে বলল, "এইটা আজকের প্রথম আলো। তুমি এইটা হাতে নিয়ে দাঁড়াও তোমার বাবা-মা তা হলে বুঝতে পারবে ভিডিওটা আজকে করা হয়েছে।"

সুলতান পত্রিকাটা আনিকার দিকে এগিয়ে দেয়, আনিকা সেটা নেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না। সুলতান কঠিন গলায় বলল, "নাও।"

আনিকা তবু দাঁড়িয়ে রইল, তখন কুদ্দুস বলল, "এই মেয়ের তেজ খুব বেশি। মানুষের জন্যে তেজ খুব খারাপ জিনিস—মেয়ে মানুষের জন্যে আরো বেশি খারাপ। সুলতান ভাই যদি বলেন তা হলে ছেমড়িরে একটু টাইট দেই।"

সুলতান মুখ শক্ত করে বলল, "না। যদি টাইট দিতে হয় তোর দিতে হবে না। আমিই দিব।" তারপর আনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝেছ মেয়ে আমাকে রাগিও না। এমনিতেই অনেক ঝামেলা। নিজে যদি না নাও আমি দড়ি দিয়ে বেঁধে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব।"

আনিকা তখন প্রথম আলোটা নিয়ে এটা খুলে দাঁড়াল। সুলতান ভিডিও ক্যামেরাটা চোখে লাগিয়ে মিনিট খানেক আনিকার ভিডিও করে ক্যামেরা নামিয়ে রেখে বলল, "ব্যস, কাজ শেষ।"

সে ক্যামেরাটা চান্দুর হাতে দিয়ে হঠাৎ করে কোমরে গুঁজে রাখা রিভলবারটা বের করে আনিকার মাথায় ধরল, বলল, "এই মেয়ে, তোমার তেজ খুব বেশি? আমার ভিডিও তোলা শেষ, আমি যদি এখন গুলি করে তোমার ঘিলু বের করে দিই? দিব?" সুলতান হুঙ্কার দিয়ে বলল, "দিব?"

আমি আনিকার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "বদমাইশের বাচ্চা বদমাইশ তোমার বাবারও সেই সাহস হবে না। যদি আমার কিছু হয় আমার আব্বু খালি তোমার না তোমার চৌদ্দগুষ্ঠির টুটি ছিঁড়ে ফেলবে।"

সুলতান একেবারে থতমত খেয়ে গেল। আনিকা বলল, "আমার আব্বু মুক্তিযোদ্ধা, তোমার মতো জানোয়ারদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমার আব্বু জানে। যদি আমার কিছু হয় তা হলে আমার আব্বু পুলিশের কাছে যাবে না, বিডিআরের কাছে যাবে না, মিলিটারির কাছেও যাবে না। আমার আব্বু নিজে তোমাদের একজন একজনকে খুঁজে বের করে খুন করবে। দরকার হলে জাহান্নাম থেকে তোমাদের খুঁজে বের করবে। বুঝেছ?"

সুলতান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুদ্দুস বলল, "আজকালকের পোলাপানের কোনো রকম মানসম্মান জ্ঞান নাই—"

বদি বলল, "ছেড়ে দেন সুলতান ভাই। এই মেয়ের মাথার ঠিক নাই। কী বলতে কী বলে কিছু ঠিক নাই।"

সুলতান তখন তার রিভলবারটা কোমরে গুঁজে রেখে বলল, "এদেরকে কোথাও বেঁধেছেঁদে রাখ। আবার না পালিয়ে যায়।"

"গাছের সাথে বেঁধে রাখি?"

"রাখ।"

"আমি এই ভিডিওটা নিয়ে যাই। কী করতে হবে তোদের পরে জানাব।"

"এখনই চলে যাবেন?" কুদ্দুস একেবারে বিগলিত হয়ে বলল, "সুলতান ভাই আপনি খেয়ে যাবেন না? হরিণের মাংসটা রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না।"

"না-না—আমার এত সময় নাই।"

মাঝিটা বলল, "স্যার খেয়েই যান। জোয়ারটা না ধরলে এমনিতেই যেতে অনেক বেশি সময় লাগবে। এখন রওনা দেওয়া আর এক ঘণ্টা পরে রওনা দেওয়া একই কথা।"

সুলতান খালের পানির দিকে তাকিয়ে বলল, "জোয়ার এখনো পুরো ধরে নাই?"

"জে না।"

"ও।" সুলতান ট্রলারের গলুইয়ে বসে বলল, "তা হলে তাড়াতাড়ি পাকা। গোশতের মাঝে ঝাল কম করে দিস। আমার আবার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা আছে।"

"জে আচ্ছা, সুলতান ভাই।"

আমরা ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম আনিকা, জয়ন্ত আর কাজলকে কুদ্দুস আর বদি খুব যত্ন করে একটা গাছের সাথে বাঁধল। তারা তিন জন গাছের গুঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে আছে, হাতগুলো পিছনে গাছের সাথে বাঁধা। তিন জনের কেউ খুব একটা আপত্তি করল না, শুধু দেখলাম চোখের কোনা দিয়ে আমাদের দেখার চেষ্টা করল। এখন আমরা হচ্ছি একমাত্র ভরসা।

নৌকা থেকে চুলা, ডেকচি, বাসনকোসন নামিয়ে যখন বদমাইশগুলো রান্নার আয়োজন করছে তখন আমি তারেক আর কাসেম বুকে ভর দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে সরে এলাম। একটু বনের ভেতরে ঢুকে যাবার পর পা টিপে টিপে আমরা আমাদের আগের জায়গায় হাজির হলাম। আমাদের ব্যাকপেকগুলো এখানে রেখে গিয়েছিলাম। সেগুলো ঘিরে আমরা বসে একজন আরেকজনের দিকে তাকাই। কাসেম বলল, "অবস্থা কেরোসিন।"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ। পাঁচ জন মানুষ তিনটা অস্ত্র। একটা বন্দুক, একটা রিভলবার, একটা কাটা রাইফেল।"

কাসেম বলল, "কিরিচও আছে।"

"হ্যাঁ। কিরিচও আছে।"

তারেক বলল, "আমরা টা হলে কী করব?"

আমরা কী করব সেটা জানি না তাই একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম। ঘুরে ঘুরে বারবার আমরা কাসেমের দিকে তাকালাম—সে আমাদের একমাত্র ভরসা। কাসেম বলল, "যদি বন্দুক না থাকত তা হলে দেখে নিতাম।"

আমি বললাম, "বন্দুকগুলো চুরি করা যায় না?"

"চুরি?"

"হ্যাঁ। শুধু সুলতান তার রিভলবারটা কোমরে গুঁজে রাখে। অন্যেরা তো এখানে-সেখানে রেখে দেয়। যদি লুকিয়ে—"

আমরা বিষয়টা নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করতে থাকি। একেবারে দিনের বেলা সেটা হচ্ছে সমস্যা। তারেক মাথা চুলকে বলল, "টোমাডের মনে আছে জয়ন্টের ব্যাকপেকে স্লিপিং পিল ছিল?"

'হ্যাঁ। কী হয়েছে স্লিপিং পিলের?"

"সবাই টো এখন খাবে। ওডের খাবারের মাঝে স্লিপিং পিল ডিয়ে ডিলে কেমন হয়?"

আইডিয়াটা খারাপ না, যদি স্লিপিং পিল খাইয়ে দুই-তিন জনকেও কাবু করে ফেলা যায় তা হলে খারাপ কী। কিন্তু সেটা করা যায় কেমন করে?

কাসেম বলল, "আমরা মাত্র তিন জন! আরো তিন জন থাকলে—"

হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"জয়ন্ত, কাজল আর আনিকাকে তো গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে।"

"হ্যাঁ।"

"গাছটার আশপাশে ঝোপঝাড় আছে।"

"হ্যাঁ।"

"আমরা লুকিয়ে গিয়ে ওদের খুলে দিতে পারি।"

"দেখে ফেলবে।"

"দেখবে না।" আমি মাথা নাড়লাম, "আমাদের শরীরে গাছের ডাল ঝোপঝাড় বেঁধে গুড়ি মেরে যাব, খুব আস্তে আস্তে। ওদের দড়িটা খুলে দিয়ে ওদের কাছে কয়টা লাঠি দিয়ে আসব। দরকার হলে তারাও লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়বে।"

তারেক বলল, "সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে ওডের অস্ত্রগুলো। ওডের বন্দুক। ওডের রিভলবার।"

"হ্যাঁ।" কাসেম মাথা নাড়ল, "প্রথমেই সেগুলো কেড়ে নিতে হবে।"

আমি বললাম, "আমাদের সুবিধা কী জানিস?"

"কী?"

"বদমাইশগুলো আমাদের কথা জানে না। আমাদের নিয়ে একেবারে কোনো সন্দেহই করবে না।"

তারেক বলল, "আমাডের আরেকটা সুবিডা আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা কী?"

"কাসেম।" তারেক বলল, "আসলেই যডি মারামারি করটে হয় কাসেম একাই সবগুলোকে ফ্ল্যাট করে ডিটে পারবে।"

কাসেম কোনো কথা না বলে ঘ্রোঁত করে একটা শব্দ করল, যার অর্থ তারেক ঠিকই বলেছে। সে ইচ্ছে করলে পারবে।

আমরা তিন জন তারপর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। ঘন ঝোপ হয় এরকম কিছু ডালপালা তারেক আর কাসেম মিলে আমার শরীরে, মাথায়, হাতে-পায়ে এমনভাবে বেঁধে দিল যে মাটিতে গুড়ি মেরে থাকলে আমাকে একটা ঝোপের মতো মনে হয়। আমি যদি এখন গুড়ি মেরে খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হই—কেউ এতটুকু সন্দেহ করবে না। চারদিকে এরকম ঝোপঝাড় তার মাঝে পুরোপুরি মিশে যাওয়া যাবে।

জয়ন্তের ব্যাকপেক থেকে ঘুমের ওষুধের ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করে কবি জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। কাসেম সবচেয়ে ধারালো চাকুটা আমার হাতে দিল। এটা দিয়ে আনিকা, জয়ন্ত আর কাজলের হাতের দড়ি কেটে দিতে হবে। খুঁজেপেতে কয়েকটা লাঠি বের করা হল যেগুলো খুব লম্বা নয়, ভারীও নয় কিন্তু শক্ত। একসাথে দমাদম করে মেরে যেন যে কোনো মানুষকে লম্বা করে ফেলা যায়।

আমরা বাইনোকুলার দিয়ে দূর থেকে পুরো এলাকাটা দেখলাম। খালের কাছে চুলো পেতেছে, তার কাছে একটা গাছে কুদ্দুস তার বন্দুকটা হেলান দিয়ে রেখেছে। চান্দুর কাটা রাইফেলটা ট্রলারের ভেতর সিটের ওপর। আমরা যখন তাদের আক্রমণ করব তখন এই দুটো অস্ত্র সবার আগে দখল করতে হবে যেভাবেই হোক।

আমরা আবার গুড়ি মেরে যতটুকু সম্ভব কাছে চলে এলাম। তারপর তারেক আর কাসেম একদিকে সরে গেল, আমি রওনা দিলাম আনিকা, জয়ন্ত আর কাজলের কাছে। চান্দু ট্রলারের ভেতর শুয়ে আছে, সুলতান গলুইয়ে আধ শোয়া হয়ে আছে। অন্যেরা চুলার কাছাকাছি রান্নাবান্না করছে। মানুষগুলো নিশ্চয়ই খুব ভালো রান্না করে কারণ খুব সুন্দর

রান্নার গন্ধ বের হয়েছে—পুরো একদিন আমরা ভালো করে খাই নি রান্নার গন্ধে জিবে পানি এসে যেতে চায়।

আমি খুব ধীরে ধীরে আনিকা, জয়ন্ত আর কাজলের কাছে পৌঁছলাম। যখন কাছাকাছি গিয়েছি তখন শুনলাম তিন জন নিচুগলায় কথা বলছে। কাজল বলল, "কোনোদিন আসবে না।"

জয়ন্ত বলল, "আসবে। দেখিস ইবু, তারেক আর কাসেম কিছু একটা ব্যবস্থা করবে।"

"কী ব্যবস্থা করবে?"

"সেটা জানি না। কিন্তু ইবুর মাথায় খুব বুদ্ধি। বেশিরভাগই অবিশ্যি ফিচলে বুদ্ধি—"

আমি তখন একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, ফিসফিস করে বললাম, "এই তোরা খুব স্বাভাবিক থাক।"

তিন জন একসাথে চমকে উঠল, তারপর একেবারে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। স্বাভাবিক থাকা খুব সহজ কিন্তু স্বাভাবিক থাকার ভান করা এত সহজ না। আমি আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমি তোদের হাতের দড়ি কেটে দিব।"

জয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছে।"

হাতের দড়িটা কাটতে একটু সময় লাগল—এমনভাবে বেঁধেছে যে অনেকক্ষণ লাগল কাটতে। শেষ পর্যন্ত কাটা শেষ হল, জয়ন্ত বলল, "হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "গুড। কিন্তু তোরা হাত এখানেই রাখবি। সরাবি না। দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে, তোদের হাত খোলা।"

"ঠিক আছে।"

"তিনটা লাঠি রেখে যাচ্ছি। দেখেছিস?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুই কোথায়?"

"পিছনের ঝোপটাই আমি।"

জয়ন্ত দাঁত বের করে হাসল। বলল, "তোর যা ফিচলে বুদ্ধি!"

"শোন। যখন আক্রমণ করব তখন একসাথে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বি।"

"ঠিক আছে।"

"কোনো মায়াদয়া দেখাবি না।"

"দেখাব না।"

"আমি গেলাম।"

"ঠিক আছে।"

আমি আবার একটা ঝোপ হয়ে আস্তে আস্তে পিছনে সরে গেলাম। আমার হাতে ঘুমের ওষুধের গুঁড়ো। এগুলো খাবারের মাঝে দিতে পারলে খুব চমৎকার হত। কিন্তু রান্নার কাছাকাছি যাবার কোনো উপায় নেই। ঝোপঝাড়ের কাছে চায়ের সরঞ্জাম রেখেছে, সেখানে একটা চিনির কৌটা আছে তার ভিতরে ঘুমের ওষুধের পুরিয়াটা ঢেলে দিতে পারি। চায়ের সাথে কেউ যদি চিনি খায় তা হলেই কাবু হয়ে যাবে।

আমি তাই খুব আস্তে আস্তে চায়ের সরঞ্জামের কাছে গিয়ে চিনির কৌটার মাঝে ওষুধের গুঁড়োটা ঢেলে দিলাম। আসলেই এই বদমাইশগুলো চা খাবে কি না জানি না,

খেলেও কখন খাবে কীভাবে খাবে তাও জানি না, কিন্তু যদি খায় তা হলে বেটাদের আর দেখতে হবে না।

আমি আবার গুড়ি মেরে খুব আস্তে আস্তে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। ঝোপ হয়ে থাকার কাজ আমার শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা করা, যদি ভালো কোনো সুযোগ পাওয়া যায় তা হলেই আক্রমণ। তা না হলে আমরা অপেক্ষা করব। কোনো তাড়াহুড়ো করব না। এরকম ভয়ঙ্কর মানুষের সাথে খামকা নিজে থেকে ঝামেলা করব না।

আমরা ঝোপের নিচে শুয়ে আছি, তখন তাদের কথা শুনতে পেলাম। সুলতান বলল, "কী হল? বললি এক ঘণ্টার মাঝে হয়ে যাবে এখন দেখি সোয়া ঘণ্টার ওপর।"

কুদ্দুস বলল, "এই তো প্রায় হয়ে গেছে সুলতান ভাই। হরিণটা ছিলতে হল সেই জন্যে—"

বদি বলল, "যতক্ষণ খাবার রেডি না হচ্ছে ততক্ষণ একটু চা দিই?"

আমি হাত জোড় করে খোদাকে মনে মনে বললাম, "হেই খোদা, এই বদমাইশটারে একটু চা খাওয়াও! প্লিজ খোদা! প্লি-ই-জ!"

কিন্তু খোদা আমার দোয়া শুনলেন না, কারণ সুলতান বলল, "না, খাবার আগে খালি পেটে চা খেয়ে মরব নাকি? আমার আবার গেস্ট্রিকের সমস্যা।"

কিন্তু ট্রলারের ভেতর থেকে চান্দু উঠে বসে বলল, "আমি খাব, আমারে এক কাপ দাও।"

আমরা আনন্দে নিঃশব্দে হাততালি দিলাম। চা খাওয়া একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো, তাই যখন চা বানানো হল তখন কুদ্দুস আর মাঝিও এক কাপ খেতে চাইল। আমরা চোখ বড় বড় করে দেখলাম কাপের মাঝে টি ব্যাগ দিয়ে কনডেন্সড মিল্ক দেওয়া হচ্ছে এবং চিনির কৌটা থেকে চিনি দেওয়া হচ্ছে। চিনির সাথে কার কাছে কতটুকু স্লিপিং পিল যাবে সেটাই এখন একমাত্র বিষয়।

স্লিপিং পিলের কাজ হল খুব দ্রুত। আমরা দেখলাম নৌকার ট্রলারে চান্দু মুখ হাঁ করে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়েছে। ট্রলারের মাঝি একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। কুদ্দুস এখনো ঘুমায় নি, জেগে থাকার চেষ্টা করছে কিন্তু জেগে থাকতে পারছে না। একটু পরে পরে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে তার এত ঘুম পাচ্ছে কেন!

আমি বললাম, "এখনই সময়!"

তারেক বলল, "হ্যাঁ।"

কাসেম বলল, "কীভাবে করবি?"

"সবচেয়ে ভালো হয়, যদি খালের পানিতে ডুব দিয়ে একজন পিছন থেকে ট্রলারে উঠে কাটা রাইফেলটা হাতে নেয়।"

কাসেম বলল, "ঠিক আছে, আমি যাব।"

"গুড!" আমি বললাম, "আমি এক দৌড়ে নিই কুদ্দুসের বন্দুকটা।"

"পারবি তো?"

"পারব।"

তারেক বলল, "আর আমি?"

"তুই এই লাঠি নিয়ে যা সুলতানের কাছে। তোর সাথে যাবে জয়ন্ত, কাজল আর আনিকা। চার জন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বি।"

"আর কুদ্দুস?"

"তার কাছে তো অস্ত্র নাই—তাই ভয় কীসের?"

"ঠিক আছে।"

কাসেম বলল, "আমি গেলাম তা হলে।"

"যা।"

কাসেম কী একটা দোয়া পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিল, তারপর আমাদের বুকে ফুঁ দিল, তারপর ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল। অনেকদূর দিয়ে সে খালে নামবে যেন কেউ দেখতে না পারে।

আমি আর তারেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকি, কাসেমকে ট্রলারের উপরে দেখা মাত্রই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করছে। মনে হচ্ছে অন্যেরাও বুঝি সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে আমাদের দিকে তাকাবে।

এদিকে কুদ্দুসের অবস্থা হয়েছে খুব বিচিত্র। সে বুঝতে পারছে না কেন সে চোখ খোলা রাখতে পারছে না। বদি তাকে বলেছে নৌকার ভেতর থেকে প্লেটগুলো নিয়ে আসতে। নৌকা পর্যন্ত গিয়ে সে পাটাতনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। আমার এখন দুশ্চিন্তা লাগতে থাকে ঘুমের ওষুধ বেশি খেয়ে মানুষগুলো আবার মরেটরে যাবে না তো?

আমরা একটু পরে পরে আমাদের ঘড়ি দেখছি, কাসেম গিয়েছে প্রায় দশ মিনিট হল। এতক্ষণে তার চলে আসার কথা। সুন্দরবনের নদীতে খালে নাকি কুমির থাকে, সেগুলো কিছু একটা কাসেমকে ধরে টেনে নিয়ে যায় নি তো?

শেষ পর্যন্ত আমরা কাসেমকে দেখতে পেলাম, সে নিঃশব্দে ট্রলারে উঠেছে, আমরা দেখলাম সে চান্দুর কাটা রাইফেলটা তুলেছে—তার মুখে এগাল ওগাল জোড়া হাসি! আমাদের আর কোনো ভয় নাই। কাসেম হাত তুলে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল, সাথে সাথে আমরা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি বিদ্যুৎগতিতে বন্দুকটা তুলে নিয়েছি, একদিক থেকে তারেক, অন্যদিক থেকে আনিকা জয়ন্ত আর কাজল লাঠি নিয়ে সুলতানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লাঠির ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেলাম, দুই হাতে মুখ ঢেকে সুলতান যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। বদি তার চুলার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সে বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। আমি বন্দুকটা তার দিকে তাক করে ধরে বলেছি—"হাত তুলো। হাত তুলো উপরে—না হলে খুন করে ফেলব।"

বদি হাত তোলার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু বদি নয়—সুলতানও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। চার জন মিলে তাকে মাটিতে চেপে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু তার ভেতরে সে কোমরে হাত দিয়ে তার রিভলবার বের করে এনেছে। কিছু বোঝার আগে সুলতান সেই রিভলবার আনিকার দিকে ধরে হিংস্র গলায় বলল, "খুন করে ফেলব।"

আমার হাতে একটা বন্দুক, আমি সেটা তাক করে ধরেছি আর মুখে বলছি খুন করে ফেলব। কিন্তু আমি খুব ভালো করে জানি আমি কোনো দিনও ট্রিগার টেনে একজন মানুষকে খুন করতে পারব না। সেই মানুষটা যত খারাপই হোক না কেন, কিংবা যত ভয়ঙ্করই হোক

না কেন আমি তাকে গুলি করতে পারব না। কিন্তু সুলতানের কথা আলাদা, সে যখন বলে খুন করে ফেলব তখন সে আসলেই খুন করে ফেলার কথা বলে।

সুলতান রিভলবারটা সবার দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "বন্দুকটা দিয়ে দাও সোনার চান, তা না হলে কিন্তু খুন হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "না। সরে যাও। গুলি করে দেব।"

সুলতান দাঁত বের করে হাসল। চোখে কালো সানগ্লাস তাই তার চোখ দুটো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু না দেখেও আমি বুঝতে পারি সেটা নিশ্চয়ই সাপের মতো ভয়ানক। সেটা স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আর এক মুহূর্ত, তারপর কিছু একটা ঘটে যাবে। আমি মনে মনে খোদাকে ডাকলাম, "হে খোদা তুমি রক্ষা কর। দোহাই খোদা।"

ঠিক তখন আমি কাসেমকে দেখতে পেলাম, নিঃশব্দে সে সুলতানের পিছনে দাঁড়াল। তার এক হাতে কাটা রাইফেল কিন্তু সে সেটা ব্যবহার করল না। সে তার ডান হাত দিয়ে সুলতানের মুখে একটা ঘুসি মারল!

কী একটা ঘুসি। সেই ঘুসির শব্দে মনে হয় পুরো সুন্দরবন কেঁপে উঠেছে। আমরা দেখলাম সুলতান একটা কাটা কলাগাছের মতো পা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে—সে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। দুলতে দুলতে একসময় ধপাস করে নিচে পড়ে গেল—হাতে তখনো রিভলবারটা ধরে রেখেছে। আনিকা, জয়ন্ত, কাজল আর তারেক তখন ছুটে গিয়ে সুলতানকে চেপে ধরেছে, তার চোখ ঘোলাটে, মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এল।

কাসেম তখন বদির দিকে তাকিয়ে বলল, "আয় আমার কাছে।"

বদি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে একবার কাসেমের দিকে, আরেকবার সুলতানের দিকে, আরেকবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কী হচ্ছে সে এখনো তার কিছুই বুঝতে পারছে না। আমি আমার হাতের বন্দুকটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "হাত তুলে দাঁড়াও, না হলে কিন্তু খুন করে ফেলব।"

কাসেম কিছু না বলে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করল। আর সেটা দেখেই বদি হঠাৎ করে তার দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল। আমার বন্দুককে সে ভয় পায় না কিন্তু কাসেমের ঘুসিকে ভয় পায়।

পুরো আক্রমণ কাজ শেষ হতে আমাদের মনে হয় পাঁচ মিনিট সময়ও লাগে নি কিন্তু মানুষগুলোকে বেঁধেছেঁদে রেডি করতে আমাদের অনেক সময় লাগল। এখন আমাদের দড়ির অভাব নেই, কাজেই খুব কায়দা করে বদমাইশগুলোকে বাঁধা হল। একেকজনকে একেকটা গাছে—যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরকেই বাঁধতে আসলে সবচেয়ে বেশি সময় লেগে গেল। একেকজন যেভাবে ঘুমাচ্ছে তারা কখন ঘুম থেকে উঠবে সেটাই এখন জল্পনা-কল্পনার বিষয়।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী আমাদের খোঁজে লোকজন আসবে আরো দুই দিন পর। দুই দিন এখানে কাটিয়ে দেওয়া এখন আর এমন কিছু কঠিন কাজ মনে হচ্ছে না। কিন্তু এখন মনে হয় আর তার দরকার নেই। যদি কোনোভাবে এই ট্রলারটা চালাতে পারি তা হলে এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারব। একবার ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে দেবার পর ট্রলার চালানো

এমন কিছু কঠিন কাজ মনে হয় না। একান্তই যদি না পারি তা হলে মাঝিটাকে নিয়ে যাব, কাসেম যদি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে একটা ঘুসি দেবার ভঙ্গি করে, আমার মনে হয় মাঝি তা হলে ট্রলার চালিয়ে নিয়ে যেতে আপত্তি করবে না।

আমাদের দুপুরের খাবারটা হল সাংঘাতিক। অনেক দিন পর গরম ভাত সবজি আর ডাল। আমরা যখন আমাদের ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছি তখনো হরিণের মাংস রান্না শেষ হয় নি। যারা রান্না করছিল তারা এখন গাছের সাথে বাঁধা—চুলার আগুন গিয়েছে নিভে, তাই সেই রান্না আর শেষ হয় নি। সবচেয়ে বড় কথা একটা হরিণের এত মায়াকাড়া চেহারা তাদের একনজর দেখলে সেটা আর খাওয়ার ইচ্ছে করে না।

খাওয়ার পর কী করব সেটা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছি তখন তারেক সুলতানের ব্যাগ খুলে ভিডিও ক্যামেরাটা বের করে এনেছে। আমরা তখন সেই ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সবার সাক্ষাৎকার নিয়ে রাখলাম। আমি হলাম ক্যামেরাম্যান আর জয়ন্ত হল আমাদের উপস্থাপক। সে একটা চামচকে ধরল মাইক্রোফোনের মতো করে, তারপর আনিকাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিস আনিকা, আপনাকে যখন কিডন্যাপার সুলতান কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছিল তখন আপনার মনের অনুভূতি কেমন হয়েছিল?"

আনিকা টেলিভিশনের নায়িকার মতো চুলগুলিকে পিছনে দিয়ে স্টাইল করে বলল, "আমার ইচ্ছে করছিল ঘুসি মেরে তার সবগুলি দাঁত ফেলে দিই। কিন্তু আমার হাত বেঁধে রেখেছিল বলে সেটা করতে পারি নি। কিন্তু সে জন্যে আমার এখন কোনো দুঃখ নেই।"

জয়ন্ত তার মাইক্রোফোনটাতে বলল, "কেন আপনার কোনো দুঃখ নেই মিস আনিকা?"

আবার সে চামচটা আনিকার সামনে মাইক্রোফোনের মতো করে ধরল, আনিকা বলল, "এখন আমার মনে কোনো দুঃখ নেই কারণ আমাদের বিখ্যাত বডিবিল্ডার মিস্টার কাসেম কিডন্যাপার সুলতানের মুখে একটা ঘুসি মেরে তার কয়েকটা দাঁত খুলে ফেলেছেন এবং কয়েকটা দাঁতের ভিত্তিপ্রস্তর নড়বড়ে করে দিয়েছেন। আমি কখনোই সেটা পারতাম না।"

জয়ন্ত বলল, "তা হলে আমাদের বডিবিল্ডার মিস্টার কাসেমের সাথে কথা বলতে হয়।" সে চামচের মাঝে বলল, "মিস্টার কাসেম ঘুসি মারার আগে এবং পরে আপনার কী অনুভূতি হয়েছিল সেটা কি একটু বলবেন?"

কাসেম ঠাট্টা মস্করা ইয়ারকি করতে পারে না। সে লজ্জা পেয়ে বলল, "ধুর। ফাজলেমি করিস না।"

জয়ন্ত বলল, "আমাদের বডিবিল্ডার মি. কাসেম এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছেন না। কাজেই আমরা এখন কিডন্যাপার জনাব সুলতানের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করছি।" আমরা তখন গাছে বাঁধা সুলতানের কাছে গেলাম। জয়ন্ত তার মাইক্রোফোনে বলল, "কিডন্যাপার মি. সুলতান, আপনি যখন আমাদের বডিবিল্ডার মি. কাসেমের ঘুসি খেলেন সেই মুহূর্তে আপনার মনের ভেতরে কেমন অনুভূতি হয়েছিল সেটি কি একটু বলবেন?"

জয়ন্ত চামচটা সুলতানের মুখের কাছে ধরল। সুলতান কালো সানগ্লাসের পিছনে আগুনের ভাটার মতো চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার মাইক্রোফোনে বলল, "সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন

আমাদের কিডন্যাপার মিস্টার সুলতান ঘুসি খাওয়ার পুরো ব্যাপারটিতে এত অভিভূত হয়ে গেছেন যে তিনি বাক্যহারা। আমরা একটু পরে অন্যান্য বিষয় জানার জন্যে আবার তার কাছে ফিরে আসব। এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্যে স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি বিজ্ঞাপনের বিরতির জন্যে!"

আমরা তখন কাটা রাইফেলের একটা বিজ্ঞাপন করলাম—কত সহজে এটা দিয়ে গুলি করা যায়—মানুষ খুন করা যায় সেটা বর্ণনা করলাম। বিজ্ঞাপন তৈরি করার সময় হাসতে হাসতে আমরা গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম বলে শুনতে পাই নি ঠিক তখন একটা ট্রলার এসে থেমেছে। একটু পরে শুনতে পেলাম কে যেন মেগাফোনে ডাকছে, "ইবু কাসেম কাজল তারেক ও জয়ন্ত, ইবু—কাসেম—কাজল তারেক ও জয়ন্ত—"

আমরা তখন আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, জুয়েল ভাই চলে এসেছেন। আমাদের চিৎকার শুনে কিছুক্ষণের মাঝেই জুয়েল ভাই আর খাকি পোশাক পরা কয়েকজন মানুষ চলে এল। জুয়েল ভাই চিৎকার করে বললেন, "তোমরা তা হলে বেঁচে আছ!"

আমরা ছুটতে ছুটতে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "হ্যাঁ, জুয়েল ভাই, বেঁচে আছি।"

"আল্লাহ মেহেরবান।" জুয়েল ভাই একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সবাই আমাকে বলেছে তোমরা তোমার মামার সাথে ঢাকা চলে গেছ। শুধু আমি বলেছি না এরা যায় নাই। এরা আমাকে কথা দিয়েছিল এরা আমাকে না বলে যাবে না! পুরো জাহাজ সবাইকে নিয়ে ঢাকা রওনা দিয়েছে আর আমি তখন—"

জুয়েল ভাই হঠাৎ থেমে গেলেন, আনিকাকে দেখিয়ে বললেন, "এটা কে?"

আমি বললাম, "এর নাম আনিকা।"

"আনিকা? সে কোথা থেকে এল?"

জয়ন্ত বলল, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি। কিন্তু মুখে বলার চাইতে চোখে দেখা ভালো। আসেন আপনাদের দেখাই।"

জুয়েল ভাই আর খাকি পোশাক পরা মানুষগুলো যখন দেখল পাঁচটা গাছে পাঁচটা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তার মাঝে তিন জন ঘুমিয়ে নাক ডাকছে তখন তারা এত অবাক হল যে সেটা বলার মতো নয়। পুরো ঘটনাটা যখন তাদের খুলে বললাম, জুয়েল ভাই একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন। আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকান আর মাথা নেড়ে বলেন, "তোমরা? তোমরা নিজেরা নিজেরা এভাবে সবাইকে ধরে ফেলেছ? খোদার কসম?"

যখন আমরা আবিষ্কার করলাম শেষটুকু যদি ভালো হয় তা হলে আগের কষ্ট এবং যন্ত্রণা এমন কিছু খারাপ ব্যাপার না।

সুন্দরবনের সেই ঘটনা আমাদের এর মাঝে কয়েক হাজারবার বলা হয়ে গেছে, আমার মনে হয় আরো কয়েক হাজারবার বলতে হবে। আমাদের বলতে ভালোই লাগে—একটা গল্প ইন্টারেস্টিং করার জন্যে বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলতে হয়, তবে আমাদের গল্পটার মাঝে কোনো কিছুই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলতে হয় না। বরং উল্টোটা হয়। যারা শোনে তারা অনেক কিছু

বিশ্বাস করতে চায় না। যেমন কোমাডো ড্রাগনের ব্যাপারটা কেউই বিশ্বাস করতে চায় না। ভাগ্যিস তারেক ছবি তুলে রেখেছিল! সেই ছবি যারাই দেখে তারাই হাঁ হয়ে যায়। আমরা পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছি এইগুলোকে কোমাডো ড্রাগন বলে না, এইগুলোর নাম ওয়াটার মনিটর, বাংলায় পানি গুইসাপ। বৈজ্ঞানিক নাম ভারানাস সালভাটর। এদের সুন্দরবনে পাওয়া যায় তবে এত বড় ওয়াটার মনিটর নাকি সুন্দরবনে এর আগে কেউ দেখে নি। একটা জীববিজ্ঞানী দল নাকি সেগুলো খুঁজতে যাবে। পাখি বিশেষজ্ঞ যেরকম আছে সেরকম গুইসাপ বিশেষজ্ঞও আছে।

তবে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথাটি মনে হয় বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করে নি। সেটার ছবি তুলে রাখা হয় নি তাই কাউকে বিশ্বাস করাতেই পারি নি। সবার ধারণা বাঘ মানুষকে পেলেই ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলে কিন্তু সেটা যে খালি শুঁকে বিরক্ত হয়ে একটু ধমক দিয়ে চলে যেতে পারে সেটা কেউ মানতে চায় না। মানতে না চাইলে নেই—মানুষজনকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমাদের কোনো দায় পড়ে নি।

তবে কিডন্যাপারের দল ধরার ব্যাপারটি নিয়ে খুব হইচই হয়েছে। আমরা যাকে ধরেছিলাম তার নাম কানা সুলতান। একটা চোখ নষ্ট বলে সব সময় সানগ্লাস পরে থাকত—ভয়ঙ্কর বড় সন্ত্রাসী নাকি। তার বিরুদ্ধে অনেক রকম মামলা আছে। সবগুলোর বিচার হলে তার কয়েকবার ফাঁসি হয়ে যাবে। তবে দেশের অবস্থা খারাপ, বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরই বিচার হয় না, কানা সুলতানের কী বিচার হবে? যদি এই মানুষ ছাড়া পেয়ে যায় তা হলে আমাদের মনে হয় খবর আছে। কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে ভয় পাই না—সাহস খুব চমৎকার জিনিস। সুন্দরবনের সেই জঙ্গলে আনিকাকে দেখে আমরা শিখেছি।

এই পর্যন্ত অনেক পত্রিকায় আমরা সাক্ষাৎকার দিয়েছি। "দুঃসাহসী কিশোর" নামে একটা পত্রিকার সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন আমাদের উপরে কভার স্টোরি করেছিল। টেলিভিশনেও ইন্টারভিউ দিয়েছি। যখন স্টুডিওতে সব আলো জ্বালিয়ে ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা নিয়ে এল তখন যা নার্ভাস লাগছিল সে আর বলার মতো নয়। সুলতানের দলকে আক্রমণ করার সময়েও এত নার্ভাস লাগে নি। যারাই টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দেখেছে তারাই বলেছে, এরা না এত সাহসী তা হলে টেলিভিশনে এরকম ভীতুর ডিম মনে হচ্ছিল কেন? কাউকে বোঝাতে পারি না জঙ্গলে সন্ত্রাসীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগে একরকম সাহস আর টেলিভিশনের ক্যামেরায় ইন্টারভিউ দিতে লাগে অন্য একরকম সাহস।

ফিরে আসার পর আনিকার পরিবারের সবার সাথে পরিচয় হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে আনিকার আব্বুকে—একেবারে ফাটাফাটি মানুষ। আমাদের দেখলেই বলেন, "আমার এক মেয়ে আর পাঁচ ছেলে। তোমরা পাঁচ জন হচ্ছ আমার পাঁচ ছেলে।"

বোন হিসেবে আনিকা অবিশ্যি খুব ডেঞ্জারাস—আমাদের বোনেরা যদি আনিকার মতো এরকম দুর্দান্ত হত তা হলে মনে হয় আমাদের কপালে অনেক দুঃখ ছিল। আনিকার আম্মু অবিশ্যি খুব সুইট মহিলা। বাসায় গেলেই এত রকম খাবার তৈরি করে ফেলেন যে খেয়ে শেষ করতে পারি না। যখন খেয়ে শেষ করতে পারি না তখন বলেন, "মনে করো তোমরা সুন্দরবনের জঙ্গলে আটকা পড়ে আছ, না খেয়ে আছ চব্বিশ ঘণ্টা—"

আমরা তখন গপাগপ খেতে থাকি।

তবে আনিকার আব্বুর সাথে কারো তুলনা হয় না। কত রকম যে তার অভিজ্ঞতা তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। কত যে মজার মজার গল্প করতে পারেন তারও কোনো শেষ নেই। মুক্তিযোদ্ধা হয়ে সেই ছেলেবেলায় যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু কেন জানি তার কথা বলতে চান না। তবে আমরা খুব চাপাচাপি করলে মাঝে মাঝে বলেন। বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ তার চোখে পানি এসে যায়। মুক্তিযুদ্ধ যতটুকু বীরত্বের তার থেকে বেশি মনে হয় দুঃখের। চশমা খুলে চোখ মুছে আনিকার আব্বু বলেন, "বুঝলে ইয়ংম্যান, এই দেশের জন্যে অনেক রক্ত গেছে। তোমাদের সেই রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।"

তারেক তখন ধরা গলায় বলে, "আপনি চিন্টা করবেন না, আংকেল। আমরা রক্তের ঋণ শোঢ করব। করবই করব।"

তারেক ঠিকই বলেছে, নিশ্চয়ই করব। করবই করব।

২৯.১.০৪